গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৫৫ বর্ষ ২৭ সংখ্যা ২১ ফেব্রুয়ারি ২০০৩ | প্রধান সম্পাদক ঃ সুকোমল দাশগুপ্ত | মূল্য ঃ ১.৫০ টাকা

যুদ্ধ বিরোধী আন্দোলনের নয়া ইতিহাস

জনগণই ইতিহাস সৃষ্টি করে, একথা আবার প্রমাণ হল ১৫ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক যুদ্ধ বিরোধী দিবসে। পাঁচ মহাদেশের ৪০০টি শহরে ঐদিন ইরাকের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চক্রান্তের প্রতিবাদে, হাজারে নয়, লাখে লাখে জনগণ পথে নেমেছিল। এরপরও হয়তো সাম্রাজ্যবাদীরা যুদ্ধে যাবে, তবে নিশ্চিত যে, যুদ্ধের সেই আগুনে সাম্রাজ্যবাদীরাই শেষপর্যন্ত পুড়ে মরবে।

১৫ ফেব্রুয়ারি আমেরিকার সানফ্রানসিসকো শহরে ৫ লক্ষ মানুষের যুদ্ধ বিরোধী মিছিল

দাবি আদায়ে বৃহত্তর আন্দোলন

সাংবাদিক সম্মেলনে কমরেড প্রভাস ঘোষ

এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে ধারাবাহিক আন্দোলনের নতুন কিছু কর্মসূচি, গত ১১ ফেব্রুয়ারি এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করা হয়। এই প্রসঙ্গেই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ বলেন, আমরা আন্দোলনের মধ্যেই আছি, আন্দোলন চলছেই। তিনি বলেন, আমরা লক্ষ্য করছি, বন্‌ধের আগে যখন সরকারের কাছে আমরা দাবিগুলি রেখেছিলাম, সরকার কোন উচ্চবাচ্য করেনি। ২৭ জানুয়ারি বাংলা বন্‌ধ সফল হওয়ার পর সরকারের দুটি ঘোষণা আমরা দেখেছি, যা জনমতের চাপে তারা করতে বাধ্য হয়েছে, যদিও তার মধ্যে প্রতারণা আছে। যেমন বস্তিবাসীদের ও হকারদের কাছ থেকে সরকার জলকর নেবে না বলেছে, কিন্তু রাস্তার কল ভাঙলে তা সারানোর দায়িত্বও তারা নেবে না, বস্তির লোকেদেরই নিজেদের খরচে তা সারাতে হবে। তার মানে বস্তির কল সারানো হবে না। এর অর্থ হচ্ছে শেষপর্যন্ত বস্তিবাসীদের জল কিনে নিতে বাধ্য করা হবে। অন্যান্যদের ক্ষেত্রে জলকর অর্ধেক কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। আমরা বলছি, সম্পূর্ণভাবে জলকর প্রত্যাহার করতে হবে। এ দাবিতে আমাদের আন্দোলন চলবে। ২০০১ সালে যখন বিদ্যুৎ কমিশন মাশুলবৃদ্ধির ওপর শুনানি শুরু করে, আমাদের দল মাশুলবৃদ্ধির বিরুদ্ধতা করে শুনানিতে অংশ নিয়েছিল। সি পি এম সেই বিদ্যুৎ

দুয়ের পাতায় দেখুন

অল ইণ্ডিয়া অ্যান্টি ইমপিরিয়ালিস্ট ফোরামের প্রতিনিধি বাগদাদ গেলেন

মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের ইরাক আক্রমণের জন্য যুদ্ধসজ্জার পটভূমিতে 'নন-অ্যালায়েনড স্টুডেন্টস অ্যাণ্ড ইয়ুথ অর্গানাই-জেশন'-এর আমন্ত্রণে ইণ্টারন্যাশনাল কনফারেন্স অন নো ওয়ার অ্যাণ্ড অ্যাগ্রেসন অন ইরাক' বিষয়ে এক সম্মেলনে যোগ দিতে বাগদাদ গিয়েছেন এস ইউ সি আই নেতা, অ্যান্টি ইম্পিরিয়ালিস্ট ফোরামের সহ-সভাপতি কমরেড মানিক মুখার্জী। ইরাকের রাজধানী বাগদাদে ১৯-২১ ফেব্রুয়ারি ঐ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে।

১৭ ফেব্রুয়ারি তাঁর কলকাতা থেকে রওনা হওয়ার আগে ১৫ই ফেব্রুয়ারি অল ইণ্ডিয়া অ্যান্টি ইমপিরিয়ালিস্ট ফোরাম আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ফোরামের সাধারণ সম্পাদক বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ সুশীল মুখোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ফোরামের সহসভাপতি কমরেড মানিক মুখার্জী।

আটের পাতায় দেখুন

ধানতলা ঃ গদিসর্বস্ব রাজনীতি সি পি এম-কে কোথায় নামিয়েছে

রাণাঘাট মহকুমার আইসমালিতে বরযাত্রী বাসে ডাকাতি, বাসচালক খুন ও মহিলাদের উপর দীর্ঘ সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা ধরে অত্যাচারের ঘটনা আজ সকলেরই জানা। এই নারকীয় ঘটনার প্রধান কারিগর ছিল সি পি এমের নেতা ও কামালপুর অঞ্চলের প্রাক্তন প্রধান শহিদুল কারিগর। আর মূল পরিচালক ছিল সি পি এম-এর আড়ংঘাটা-পানিখালি জোনাল কমিটির নেতা সুবল বাগচী। এই ন্যক্কারজনক ঘটনার পরেও লজ্জার মাথা খেয়ে সি পি এম রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাস ঐ দুই নেতাকে বহিষ্কারের ঘোষণা করে গর্বের সাথে বলেছেন — একমাত্র সি পি এম দলই এ ধরনের ঘটনা ঘটার সাথে সাথে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হিম্মত দেখাতে পারে। তিনি আরও বলেছেন, সি পি এম দলে সমাজবিরোধীদের স্থান নেই। আইসমালিতে যে দলের নেতারা ঐ পৈশাচিক কাণ্ড ঘটিয়েছে, সেই দলের রাজ্য সম্পাদক গর্ব করতে পারেন বৈকি! তবে, সেই দলে সমাজবিরোধীদের স্থান নেই — একথা সত্য নয়।

বাস্তব ঘটনা হল সি পি এম দলকে যেকোনভাবে সাহায্য করার পাশাপাশি চরম অপরাধ করলেও নেতাদের জ্ঞাতসারেই পার পাওয়া যায়; এইভাবে পার পেতে পেতে তার অপরাধের মাত্রাও বাড়তে থাকে। দ্বিতীয়ত নানা অপকর্ম করার জন্য অনেককে এই দলে নিযুক্ত করা হয় এবং সফলভাবে তা করতে পারলে তাদের দলীয় পদ দিয়ে বা অসীম ক্ষমতা দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়। কোথাও কোথাও পদ, ক্ষমতা বা বখরা নিয়ে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব হলে এবং তা চরম আকার ধারণ করলে, শক্তিশালী গোষ্ঠী অপেক্ষাকৃত দুর্বল বিরোধী গোষ্ঠীকে 'শিক্ষা দেওয়া'র জন্য বা নির্মূল করার জন্য, কোন দুষ্কর্মকে কেন্দ্র করে জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সুযোগ নিয়ে তাদের পুলিশ দিয়ে গ্রেপ্তার করার এবং দল থেকে বহিষ্কার করে নিজেরা ধোয়া

ছয়ের পাতায় দেখুন

“আমরা আন্দোলনের মধ্যেই আছি, আন্দোলন চলছেই”

একের পাতার পর

কমিশনে উপস্থিত থাকেনি। বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন ‘অ্যাবেকা’ অংশ নিয়েছিল। তারপর যখন বিদ্যুৎ কমিশন দাম বাড়ায়, সি-ই-এস-সি তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে আরও দাম বাড়াতে চেয়ে হাইকোর্টে যায়। এর বিরুদ্ধে হাইকোর্টের মামলাতেও বিদ্যুৎ গ্রাহকদের সংগঠন অ্যাবেকা অংশ নেয়। সেই সময়েও রাজ্য সরকারকে বলা হয়েছিল হাইকোর্টের মামলায় পার্টি হতে, কিন্তু রাজ্য সরকার হয়নি। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে তা করে বিদ্যুৎ কমিশন সুপ্রিম কোর্টে যায়, সি-ই-এস-সি'ও সুপ্রিম কোর্টে যায়। সুপ্রিমকোর্টেও বিদ্যুৎ গ্রাহক সংগঠন পার্টি ছিল। রাজ্য সরকারকে তখনও বলা হলেও সরকার যায়নি। সুপ্রিম কোর্টের রায়ের অপব্যাখ্যা করে কমিশন যখন আরও দাম বাড়াতে চলল, অর্থাৎ সকল রকম গ্রাহকের জন্য একই হারে মাশুল নীতি ঘোষণা করতে চলল তখনও রাজ্য সরকারকে বলা হয়েছিল, কিন্তু সরকার ঐ সম্পর্কে কোনরকম ভূমিকাই নেয়নি। এর ফলে সাধারণ গ্রাহকদের ক্ষেত্রে বিদ্যুতের দাম প্রচুর বেড়ে গেল, তবুও সরকার কিছুই করল না। ঠিক বাংলা বন্ধের তিন-চারদিন আগে হাইকোর্টে গেল তারা। সরকার যেন কিছু করছে এটা দেখিয়ে জনগণকে ঠকানোই ছিল লক্ষ্য। কিন্তু জনগণকে ঠকানো গেল না, বন্ধ হলো। বন্ধের পর রাজ্য সরকার বলল তারা সুপ্রিমকোর্টে যাবে, তাতে যদি না হয় তারা আইন করে ভরতুকি রাখবে। কি পরিমাণ রাখবে এখনও কিছু পরিষ্কার ঘোষণা করেনি। অথচ রাজ্য সরকার পরিচালিত এস-ই-বি মাশুল বাড়াবার জন্য হাইকোর্টে লড়ছে, সেখানেও গ্রাহক সংগঠন এ্যাবেকা লড়ছে। এস-ই-বি দাবি জানিয়েছে ২০০৩-০৪ সালের জন্য আরো ৬১% বিদ্যুতের মূল্য বাড়াতে হবে। সি-ই-এস-সি দাবি করেছে যা বাড়ানো হয়েছে তার উপর আরও ১৩% বাড়ানোর। এসব সম্পর্কে রাজ্য সরকার কোনরকম ভূমিকা নিচ্ছেনা। এ অবস্থায় সরকারি ঘোষণার কী মানে দাঁড়ায়? আমরা বারবার আগে বলেছি, এখনও বলছি, রাজ্য সরকারের হাতে যে বিদ্যুৎ আইন আছে তা প্রয়োগ করে কমিশনের অন্যায় সিদ্ধান্ত সরকার বাতিল করতে পারে, কিন্তু সরকার সেটা এড়িয়ে যাচ্ছে। ঐ আইন কেন প্রয়োগ করছে না সে বিষয়ে যুক্তিগ্রাহ্য কোন উত্তর জনগণের কাছে রাজ্য সরকার রাখছে না। এখানে রাজ্য সরকার চুপ। তাছাড়া এই যে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন, এই কমিশন গঠন করতে রাজ্য সরকার বাধ্য ছিল না। আজও ভারতবর্ষের ৭টি রাজ্য বিদ্যুৎ কমিশন গঠন করেনি। পশ্চিমবঙ্গ সরকারও চাইলে কমিশন গঠন না করতে পারত। ভারতবর্ষের চারটি রাজ্য নিজেরা আইন করে আলাদা কমিশন গঠন করেছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সেটাও করতে পারত। এর ফল দাঁড়িয়েছে ভারতবর্ষের মধ্যে এখন সবচেয়ে বিদ্যুতের দাম বেশি পশ্চিমবঙ্গে। অভিন্ন বিদ্যুৎমাশুল অন্য কোন রাজ্যে নেই, এখানে আছে। এ রাজ্যে কৃষকদের কাছ থেকে প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম অনেক বেশি নেওয়া হচ্ছে অন্যান্য রাজ্য থেকে। এই অবস্থায় এস ইউ সি আই-এর সিদ্ধান্ত বিদ্যুৎ নিয়ে আমাদের আন্দোলন চলবে। ১ মার্চ থেকে বাড়তি বিদ্যুৎ বিল বয়কট আন্দোলন চলবে। আন্দোলনের একটা স্তরে গিয়ে আমরা রাজ্যবাসীর কাছে আবেদন জানাব প্রতিবাদ হিসাবে একদিন বিদ্যুৎ বয়কট করতে। এ প্রস্তাবের পক্ষে আমরা জনমত সংগ্রহ করছি।

তিনি বলেন, যেসব কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটি জলকর চালু করেছে, ১৫ ফেব্রুয়ারি সেখানে এস ইউ সি আই বিক্ষোভ দেখাবে। রাজ্যের সমস্ত কোর্টগুলিতে কোর্ট ফি প্রত্যাহারের দাবিতে আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি অবস্থান বিক্ষোভ করা হবে।

কমরেড প্রভাস ঘোষ আরও বলেন — গ্রামাঞ্চলে জমির খাজনা-রেজিস্ট্রেশন ফি-মিউটেশন ফি বৃদ্ধি, ফসলের ন্যায্য দাম, বি পি এল লিস্টের কারচুপি, রেশনিং-এর সমস্যা, এসব বিষয়ে এস ইউ সি আই ব্যাপকতর আন্দোলন সংগঠিত করছে। ৭ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের চটকলগুলিতে যে ধর্মঘট হয়ে গেল, আমাদের দল সর্বতোভাবে এই ধর্মঘটে ছিল। শ্রমিকদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চলছে। উত্তরবঙ্গে চা-শ্রমিকদের ছাঁটাই করছে, চা বাগানগুলো তুলে দিচ্ছে, এর বিরুদ্ধেও আন্দোলনে আমরা আছি। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় শ্রমিকদের নানা দাবিতে আমরা আন্দোলন করছি। ছাত্রদের উপর যে ব্যাপক ফি বাড়ানো হল তার বিরুদ্ধে আমরা লড়ছি। শিক্ষার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকার যে আক্রমণ করছে তার বিরুদ্ধে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে বৃহত্তর আন্দোলনের প্রস্তুতি আমরা নিচ্ছি। হাসপাতালের চার্জবৃদ্ধি, অব্যবস্থা এবং হাসপাতালগুলির বেসরকারীকরণের চেষ্টার বিরুদ্ধে ব্যাপকতর আন্দোলনে আমরা নামতে যাচ্ছি।

তিনি বলেন, আমরা ইতিমধ্যে রাজ্যের জনগণের কাছ থেকে লিখিত মতামত সংগ্রহ করছি। যে কর্মসূচিগুলি আমরা নিয়েছি, এগুলিকে জনগণ সমর্থন করছেন কিনা, জনগণের আন্দোলনের বিষয়ে কোন সাজেশানস্‌ আছে কিনা এবং আমরা যে ঘোষণা করেছি আইন অমান্য করব, প্রশাসনিক দপ্তর অবরোধ করব, প্রয়োজনে ৪৮ ঘণ্টা বাংলা বন্ধের দিকে যাব — এই সমস্ত বিষয়ে জনগণের মতামত আমরা চাইছি। সেই মতামতের ভিত্তিতে অর্থাৎ জনগণ যদি আরও উন্নত সাজেশনস্‌ দেন, তবে সেগুলিকে যুক্ত করে তার ভিত্তিতে আমরা আন্দোলনে নামব। তিনি এ প্রসঙ্গে আরো বলেন — রাজ্যের সমস্ত জায়গায় আমরা আন্দোলনের গণকমিটি গঠন করছি। হাজারে হাজারে এই গণকমিটি হবে। আমরা আন্দোলনের জন্য কয়েক লক্ষ ভলান্টিয়ার সংগ্রহ করছি শ্রমিক খেতমজুর কৃষক মধ্যবিত্ত সমস্ত স্তর থেকে। আমরা একটা দীর্ঘস্থায়ী লাগাতার গণআন্দোলনের পরিকল্পিত রাস্তায় এগোচ্ছি, যেটা আমাদের ঘোষণায় ছিল। আমরা একদিনের বন্ধের স্টান্টের রাজনীতি করিনি।

তৃণমূল কংগ্রেস সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন — তৃণমূলের রাজনীতি ও আমাদের রাজনীতি সম্পূর্ণ আলাদা। তৃণমূলের রাজনীতি মন্ত্রীত্ব পাবার, ভোট পাবার রাজনীতি। তার জন্য জনগণের দাবিকে তারা ব্যবহার করতে চাইছে। আর আমাদের রাজনীতি হচ্ছে জনগণের দাবি আদায় করা, তারজন্য সংগঠিত সুশৃঙ্খল একটা উন্নত নীতিনৈতিকতা ভিত্তিক লাগাতার আন্দোলন গড়ে তোলা। দু'টির উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম সম্পূর্ণ আলাদা, এখানে মিলের কোন প্রশ্ন নেই। পশ্চিমবঙ্গের জনগণ ঠিক করবেন এই দুটো রাজনীতির মধ্যে কোন্‌টা তারা গ্রহণ করবেন।

ধানতলার ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত চাই

মুখ্যমন্ত্রীকে কমরেড দেবপ্রসাদ সরকারের চিঠি

গত ১২ ফেব্রুয়ারি নদীয়া জেলার ধানতলায় গিয়ে সরেজমিনে দেখে এবং আক্রান্তদের আত্মীয়স্বজন ও স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে কথা বলে দলের পরিষদীয় নেতা কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার মুখ্যমন্ত্রীকে এক পত্র দিয়েছেন। ধানতলায় তাঁর সঙ্গে ছিলেন এস ইউ সি আই নদীয়া জেলা সম্পাদক কমরেড সুজিত ভট্টশালী।

কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার তাঁর চিঠিতে লিখেছেন —

হামলার শিকার আক্রান্তদের পরিবার পরিজন এবং স্থানীয় জনসাধারণের সাথে সাক্ষাৎ করে যে অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরেছি তার মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি বলে অনুভব করছি। প্রথমত, উল্লেখিত ঘটনায় যারা আক্রান্ত তাদের এবং স্থানীয় সাধারণ মানুষের অভিযোগ যে, সংশ্লিষ্ট থানা আক্রান্তদের কাছ থেকে কোন লিখিত অভিযোগ গ্রহণ করতে রাজি হচ্ছে না। যেমন, উল্লেখিত হামলার ঘটনায় বিয়েবাড়ির প্রথম যে বাসটির চালক সমীর ঘোষ দুষ্কৃতীদের হাতে খুন হলেন সেই বাসের আরোহী, বরযাত্রীদের অভিভাবক, কোচিয়ামারা নিবাসী সদ্যবিবাহিত যুবক কার্তিক ঘোষের বাবা অনিল ঘোষ আমার কাছে অভিযোগ করেছেন যে, ঘটনার পর দু'বার থানায় লিখিত অভিযোগ জানাতে গেলেও সংশ্লিষ্ট থানা তাঁর কাছ থেকে লিখিত অভিযোগ নিতে অস্বীকার করে। উল্লেখিত ঘটনায় আক্রান্তদের কাছ থেকে লিখিত অভিযোগ গ্রহণ করতে থানা অস্বীকার করল কেন সে ব্যাপারে আপনাকে তদন্ত করে দেখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। দ্বিতীয় বিষয়টি হল — এই ধরনের ভয়ঙ্কর আক্রমণের হাত থেকে যাত্রীদের বাঁচাবার জন্য যে বাসচালক সমীর ঘোষ অত্যন্ত সাহস এবং দৃঢ়তার সাথে প্রতিবাদ করতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের হাতে নৃশংসভাবে খুন হলেন, সেই যুবকের সাহসিকতা ও প্রাণদানের যথার্থ মর্যাদা ও স্বীকৃতি দিয়ে দুই নাবালিকা সন্তান সহ তার অসহায় পরিবারের আর্থিক পুনর্বাসন, বিশেষ করে তার সদ্যবিধবা স্ত্রী মাধবী ঘোষের কর্মসংস্থানের প্রশ্নে এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন ব্যবস্থা করা দূরে থাক, কোন প্রতিশ্রুতি পর্যন্ত দেওয়া হয়নি, যা মানবিক দিক থেকে সরকারের ন্যূনতম কর্তব্যের মধ্যে পড়ে। আশা করি, এ বিষয়টি আপনি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করবেন।

পরিশেষে আমার দাবি —

১। সমগ্র ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে এবং সকল অপরাধীকে গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি দিতে হবে,

২। নিহত বাসচালকের পরিজনদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং উক্ত বাসচালকের বিধবা স্ত্রীর কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে,

৩। দলের রং না দেখে সর্বত্র সমাজবিরোধী দমনে পুলিশকে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিতে হবে,

৪। পুলিশ-প্রশাসনকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে দিতে হবে।

প্রবীণ পার্টি দরদীর জীবনাবসান

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার আগরপাড়া-কামারহাটি অঞ্চলে এস ইউ সি আই দলের ঘনিষ্ঠ দরদী-সমর্থক কমরেড ইলা দত্ত (৬৭) দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে ক্যালকাটা হার্ট ক্লিনিক এ্যান্ড হসপিটালে গত ২২ জানুয়ারি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর স্মরণে ৮ ফেব্রুয়ারি কামারহাটিতে এক স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা কমিটির সদস্য কমরেড অমল সেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐ সভায় বক্তব্য রাখেন মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের জেলা সভানেত্রী কমরেড ইন্দ্রাণী হালদার এবং দলের জেলা সম্পাদক কমরেড সদানন্দ বাগল। সকলেই প্রয়াত কমরেড ইলা দত্তের স্নেহশীল চরিত্রের দিকটি উল্লেখ করেন।

বাধা না দিলে সাধারণ মানুষের ক্ষমতার বাইরে চলে যাবে বিদ্যুতের দাম

বিদ্যুৎ গ্রাহকদের ক্ষেত্রে ১৯৯১ সাল থেকে লাগামহীনভাবে যে মূল্যবৃদ্ধি শুরু হয়েছে, বিশেষভাবে সি-ই-এস-সি'র গ্রাহকদের ফেব্রুয়ারি মাসের বিলে তা এক নতুন রূপ পেতে চলেছে। অভিন্ন মাশুল নীতির ভিত্তিতে তৈরি পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের রায় কার্যকর হচ্ছে ফেব্রুয়ারি মাসের বিলে। গ্রাহকেরা এই বিল পেতে শুরু করবেন ঐ মাসের ২৪/২৫ তারিখ থেকে। এই বিলেই সকলের জন্য ইউনিট প্রতি ৩৯০ পয়সা হারে বিদ্যুতের দাম চেয়ে সি-ই-এস-সি তার ১৮ লক্ষ গ্রাহককে বিল পাঠাচ্ছে। এই বিলই হবে ভারতবর্ষে প্রথম তথাকথিত 'পারস্পরিক ভরতুকিহীন বিদ্যুৎ বিল। সংবাদে প্রকাশ, এর ফলে সি-ই-এস-সি'র ১৮ লক্ষ বিদ্যুৎ গ্রাহকের মধ্যে ১৭ লক্ষাধিক বিদ্যুৎ গ্রাহকের দাম বাড়বে অস্বাভাবিক হারে। আর মাত্র অল্প কয়েক হাজার গ্রাহকের দাম কমবে।

এখানেই শেষ নয়। এর সাথে যুক্ত হবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদনের ভিত্তিতে ইউনিট প্রতি ২৫ পয়সা হারে বকেয়া ফুয়েল সারচার্জ। এই বকেয়া ফুয়েল সারচার্জ দিতে হবে ২ বছর। সরকারি ডিউটি কালেকশান নীতি অনুযায়ী স্বাভাবিকভাবেই সরকারি ডিউটি বাড়বে এই ১৭ লক্ষ গ্রাহকের। যেহেতু সি-ই-এস-সি গ্রাহকদের কাছ থেকে ২০০০ সালের এপ্রিল থেকে ৩৮১ বা ৩৯০ পয়সা ইউনিট হিসাবে দাম আদায় করেনি অর্থাৎ 'কম দাম' নিয়েছে তাই ঐ সময় থেকে ২০০৩ এর জানুয়ারি মাস পর্যন্ত অর্থাৎ ৩৪ মাসের বকেয়া দিতে হবে গ্রাহকদের। এই বকেয়া আদায় শুরু হবে এপ্রিল মাসের বিল থেকে। হিসাবে দেখা যাচ্ছে, একজন ১০০ ইউনিটের গৃহস্থ বিদ্যুৎ গ্রাহক — যিনি ২০০১ সালের কমিশনের রায়ের আগে ১০০ ইউনিটের দাম দিতেন ২৩৩ টাকা, তাঁকে কমিশনের রায়ের ভিত্তিতে ফেব্রুয়ারি মাসে দিতে হবে ৪৭৮ টাকা। বকেয়া এবং ফুয়েল সারচার্জ নিয়ে এপ্রিলে বিল দাঁড়াবে ৬৭৩ টাকা। এখানেই শেষ নয়। সি-ই-এস-সি বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কাছে ইতিমধ্যেই ২০০২-০৩ সালের জন্য আরো ১০.৫% এবং ২০০৩-৪ সালের জন্য ১৩.৩৩% (২০০১-০২ সালের তুলনায়) দাম বাড়াবার জন্য আবেদন করেছে। ফেব্রুয়ারি মাসেই এই শুনানি হবে। এক মাসের মধ্যে রায় প্রকাশ পেলে এপ্রিল মাসের বিলে এই বর্ধিত দামের বোঝা এবং তার সাথে আবার নতুন বকেয়া যুক্ত হবে। অর্থাৎ এপ্রিল/মে মাসে ঐ ১০০ ইউনিটের গৃহস্থ গ্রাহককে ১ হাজার টাকার কাছাকাছি বিদ্যুৎ বিল মেটাবার জন্য তৈরি থাকতে হবে।

পর্ষদ গ্রাহকদের অবস্থা কি দাঁড়াচ্ছে?

রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ইতিমধ্যেই বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের কাছে ২০০২-০৩ সালের জন্য দাম বাড়াবার আবেদনে বলেছে, এই সময়কালে তাদের ঘাটতি হচ্ছে ৮৭৯.৮৪ কোটি টাকা। তাই পর্ষদের মোট আয়ের ৩৩% অর্থাৎ বাড়তি ৮৬৪.৮৪ কোটি টাকা আদায় করা যায় এমনভাবে দাম বাড়িয়ে এই ঘাটতি পূরণের অনুমতি দিতে হবে। আর, ২০০৩-০৪ সালের জন্য ২০০১-০২ সালের তুলনায় ৬১.৩% মূল্যবৃদ্ধির অনুমোদন তারা চেয়েছে। ২০০৩-০৪ সালে পর্ষদের ঘাটতি দাঁড়াচ্ছে ১৫০৩.৬৩ কোটি টাকা। এজন্য মিটারভাড়া, টেস্টিং চার্জ, ডিসকানেকশান-রিকানেকশন চার্জ বৃদ্ধি করে ১৫ কোটি, আর ইউনিট প্রতি দাম বাড়িয়ে অতিরিক্ত ১৪৮৮.৬৩ কোটি টাকা আদায়ের অনুমোদন চাওয়া হয়েছে। পর্ষদের আবেদন অনুযায়ী দাম বাড়তে পারে মোট ৮৬৪.৮৪ + ১৫ + ১৪৮৮.৬৩ = ২৩৬৮.৪৭ কোটি টাকা। এছাড়া সি-ই-এস-সি'র মতোই বিদ্যুৎ পর্ষদও ২০০০-০১ ও ২০০১-০২ সালের ঘোষিত দামে খুশি না হতে পেরে হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছে এবং সেই রায়ও দু'তিন মাসের মধ্যে ঘোষিত হবে। ফেব্রুয়ারি মাসে ২০০২-০৩ সালের বর্ধিত দাম ঘোষিত হবে। আর ফেব্রুয়ারিতে শুনানি হয়ে মার্চে ঘোষিত হবে ২০০৩-০৪ সালের বর্ধিত দাম। অর্থাৎ মার্চ মাসের বিলে দাম বাড়ছে ৩০%, আর এপ্রিল মাসে গিয়ে দাম দাঁড়াবে দ্বিগুণ। যুক্ত হবে ২০০১ সালের এপ্রিল থেকে ৩৫/৩৬ মাসের বকেয়া। যুক্ত হবে সরকারি অনুমোদনের ফলে ইউনিট প্রতি বকেয়া ফুয়েল সারচার্জ ৮ পয়সা এবং সমহারে সরকারি ডিউটি। অর্থাৎ যে গৃহস্থ বিদ্যুৎ গ্রাহক বর্তমানে পর্ষদকে ১০০ ইউনিটের জন্য ২২৫ টাকার মতো দাম দেন, সেই গ্রাহককেই এপ্রিল মাস থেকে দাম দিতে হবে আনুমানিক ৯০০ টাকা। এছাড়া পর্ষদ-গ্রাহকদের জন্য আরও দুটি 'সংবাদ' রয়েছে। যে রাজ্য সরকার গরিব-মধ্যবিত্তের জন্য সি-ই-এস-সি'র অভিন্ন মাশুল চালু হওয়ায় কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করে চলেছে, সেই সরকারই ২০০৩-০৪ সাল থেকে পর্ষদে সরকারি ভরতুকি বন্ধ করে দিচ্ছে। দ্বিতীয় বিষয়টি হল কমিশন রাজ্য সরকারকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে যে পর্ষদের ক্ষেত্রেও অভিন্ন মাশুল নীতি অর্থাৎ তথাকথিত পারস্পরিক ভরতুকি তুলে দিয়ে সকলের জন্য বিদ্যুতের এক দাম ঘোষণা করা হবে। সরকার নিয়ন্ত্রিত রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ এই প্রসঙ্গে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশনকে জানিয়েছে যে, কমিশন যা করবে, পর্ষদ তাই মেনে নেবে। অর্থাৎ অভিন্ন মাশুল ঘোষিত হলে পর্ষদ তা মেনে নেবে । ফলে ফেব্রুয়ারিতে প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যাবে সাধারণের বিদ্যুৎ বিল, সাথে একই ভাবে যুক্ত হবে বকেয়ার টাকা।

অন্যান্য আক্রমণ

ভারতীয় বিদ্যুৎ আইন অনুযায়ী একের বকেয়া অপরের কাছ থেকে আদায় করা যায় না। আবার বকেয়া রেখে কেউ যাতে চলে যেতে না পারে তার জন্যই সিকিউরিটির টাকা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সিকিউরিটি সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে, মাসিক বিলের ব্যবস্থা থাকলে সিকিউরিটি হবে এক মাসের বিলের টাকা। তিন মাসের বিলিং ব্যবস্থা চালু থাকলে সিকিউরিটি হবে ৩ মাসের বিলের টাকা। হাইকোর্টের রায়ে বলা হয়েছে, তিন মাসের বেশি টাকা সিকিউরিটি রূপে নেওয়া চলবে না। কোথাও কোম্পানিকে খুশিমতো সিকিউরিটি স্থির করে তা আদায় করার অধিকার দেওয়া নেই। কিন্তু সরকারি অনুমোদন নিয়ে আজ সি-ই-এস-সি এবং রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ সে কাজই করে চলেছে। রামের বকেয়া শ্যামের কাছ থেকে জোর করে আদায় করছে। আবার প্রতি বছর সিকিউরিটির পরিমাণ বৃদ্ধি করে কোটি কোটি টাকা গ্রাহকদের কাছ থেকে আদায় করছে। ঐ টাকার কোন হিসাব নেই। গ্রাহকদের ফেরৎ পাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। এমন কি আইন অনুযায়ী ব্যাঙ্ক রেটে সুদ দেওয়াও হচ্ছে না। আমরা ইতিপূর্বে নানা সময়ে দেখিয়েছি বিদ্যুৎ চুরি বন্ধ করার নামে রাজ্য সরকারের তৈরি "ভারতীয় বিদ্যুৎ আইন (সংশোধনী) পশ্চিমবঙ্গ ২০০১" একটি স্বৈরতান্ত্রিক আইন। এই আইনের মূল উদ্দেশ্য হল কোম্পানির হাতে স্বৈরাচারী ক্ষমতা তুলে দেওয়া। আমাদের বক্তব্য সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ এই আইন প্রয়োগ করে সি-ই-এস-সি এবং পর্ষদ কোটি কোটি টাকা আদায় করেছে। কিন্তু কমিশনের সামনে তার কোন হিসাবই দাখিল করা হয়নি। বিদ্যুৎ চুরি কতটা কমলো, তারও কোন হিসাব নেই। কারণ, সি-ই-এস-সি তার আবেদনপত্রে ২০০২-০৩ সালের জন্য ২০.৩ শতাংশ ক্ষতি গ্রাহ্য করার অনুরোধ করেছে একথা জেনেই যে, সুপ্রিম কোর্ট ২০০১-০২ সালের জন্য ১৮ শতাংশ ক্ষতির অনুমোদন দিয়ে প্রতি বছর ১ শতাংশ হারে ক্ষতি কমাতে নির্দেশ দিয়েছে। অন্যদিকে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ ২০০২-০৩ সালের জন্য ৩৪ শতাংশ ক্ষতি গ্রাহ্য করার আবেদন করেছে এ কথা জেনেই যে কমিশন ২০০১-০২ সালের জন্য ২৭.৫% ক্ষতি গ্রাহ্য করে প্রতি বছর ২.৫% ক্ষতি কমাবার জন্য নির্দেশ দিয়েছিল। এই তথ্য থেকে প্রমাণ হয় যে, স্বৈরতান্ত্রিক আইন প্রয়োগ করে বিদ্যুৎ চুরি তেমন কিছু বন্ধ হয়নি। এবং কোম্পানিরও কর্মক্ষমতার (efficiency) তেমন কোন উন্নতি ঘটেনি। উপরন্তু কমিশনের কাছে পেশ করা আবেদন পত্র থেকে জানা যাচ্ছে যে, এই স্বৈরতান্ত্রিক আইন প্রয়োগ করতে গিয়ে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। পেট্রল, ডিজেল, গাড়ি এবং হোটেলের খরচ বেড়েছে। এবং এগুলিকে দাম বাড়াবার অন্যতম কারণ হিসাবে দেখানো হয়েছে।

কৃষিতে অবস্থা ভয়াবহ হবে

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ কৃষিতে বিদ্যুতের দাম বাড়াতে চেয়েছে ১০০ ভাগ। পাঞ্জাব, রাজস্থান, তামিলনাড়ু, বিহার, ওড়িশা —প্রায় সব রাজ্যে কৃষিতে এখন বিদ্যুতের দাম রয়েছে ৫০ পয়সা ইউনিট, সেখানে পশ্চিমবঙ্গে এখনই রয়েছে ২৩৮ পয়সা ইউনিট। ১০০% বৃদ্ধির দাবি গ্রাহ্য হলে দাম দাঁড়াবে ৪ টাকা ৭৬ পয়সা প্রতি ইউনিট। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষুদ্র ও মধ্য চাষিকে বর্তমান দামে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে যেখানে ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়ার জন্যই মরণ বাঁচন লড়াই চালাতে হচ্ছে, সেখানে এই অস্বাভাবিক হারে বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি চাষিকে নিশ্চিত জমি বিক্রি করতে বাধ্য করবে, তাকে সর্বস্বান্ত করে ছাড়বে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দু'মুখো কৌশল

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, কেন্দ্রের 'মুক্ত অর্থনীতির' ফলেই বিদ্যুৎও পণ্যে পরিণত হচ্ছে এবং বিদ্যুৎ শিল্পকে বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ করা হচ্ছে। এই বেসরকারীকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণের নীতিকেই পূর্ণাঙ্গ আইনী রূপ দেবার জন্য পার্লামেণ্টে পেশ করা হয়েছে "বিদ্যুৎ বিল ২০০১"। সংবিধান অনুযায়ী বিদ্যুৎ কেন্দ্র ও রাজ্যের যুগ্ম তালিকাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এ রাজ্যে কেন্দ্রের এই নীতিকেই কার্যকরী করতে বদ্ধ পরিকর, যদিও অত্যন্ত ধূর্ততার সাথে।

সমস্যা দেখা দিয়েছে এই যে, 'বিদ্যুৎ বিল ২০০১' এখনও আইনে পরিণত হয়নি, কিন্তু বিদ্যুৎ শিল্পে দ্রুতগতিতে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বায়নের নীতি কার্যকরী করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। তাই একদিকে যেমন চলেছে সরকারি সমর্থনে পুরনো আইন ভাঙার খেলা, রাজ্য ভিত্তিক নতুন নতুন স্বৈরতান্ত্রিক আইন তৈরি, অন্যদিকে চালু করা হয়েছে বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন আইন ১৯৯৮। মিথ্যা প্রচার চলছে 'পারস্পরিক ভরতুকি' নিয়ে, ষড়যন্ত্র চলছে সরকার নিয়ন্ত্রিত সংস্থাতেও সমস্ত রকমের ভরতুকি তুলে দেবার।

কেন্দ্রীয় সরকারের এই জনস্বার্থ বিরোধী নীতির সাথে সম্পূর্ণ একমত পশ্চিমবঙ্গের সি পি এম ফ্রন্ট সরকার। তাই রাজ্য সরকার (ক) বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলোকে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমের সাথে যুক্ত করেছে এবং বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগমকে একটি কোম্পানিতে পরিণত করেছে। যাতে কোম্পানি আইন অনুযায়ী প্রথমে ১৬% লাভ, তারপর পর্ষদ আইন অনুযায়ী ৩% লাভ অর্থাৎ এক ইউনিট বিদ্যুৎ বিক্রি করে ১৯% মুনাফা করা যায়।

(খ) যে রাজ্য সরকার বলছে, গরিব-মধ্যবিত্তের বিদ্যুতে ভরতুকি রাখতে তারা হাইকোর্টে মামলা দায়ের করেছে, সেই রাজ্য সরকারই বিদ্যুৎ পর্ষদকে দেওয়া রাজ্য সরকারের সমস্ত ভরতুকি ২০০৩-০৪ সাল থেকে প্রত্যাহার করে নেবার কথা কমিশনের কাছে আবেদনে বলেছে।

(গ) একই কারণে 'বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন আইন ১৯৯৮' রাজ্য

চারের পাতায় দেখুন

সরকার ৩৯ ধারা প্রয়োগ এড়িয়ে যাচ্ছে কেন

তিনের পাতার পর

সরকারের ক্ষেত্রে চালু করা বাধ্যতামূলক না হওয়া সত্ত্বেও তারা চালু করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বেশিরভাগ রাজ্য সরকার এই আইন চালু না করে রাজ্যের আলাদা আইন তৈরি করে কমিশন তৈরি করেছে এবং ৭টি রাজ্য এখনও কোন কমিশনই গঠন করেনি।

(ঘ) পশ্চিমবঙ্গের কমিশন চালু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই চেয়ারম্যান কমিশনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে জানিয়ে দেন যে, কমিশন প্রতি বছর বাণিজ্যিক নীতির ভিত্তিতে দাম নির্ধারণ করবে এবং 'পারস্পরিক ভরতুকি' ধাপে ধাপে তুলে দেবে। এই ঘোষণার পরেও রাজ্য সরকার সম্পূর্ণ নীরব ছিল, অর্থাৎ এই নীতিকে সরকার সমর্থন করেছে।

(ঙ) কমিশন ২০০২ সালের ৭ নভেম্বর প্রথম রায়েই এই নীতিকে আংশিক কার্যকর করার সময়ে এস ইউ সি আই এবং গ্রাহক সমিতির প্রতিবাদ সত্ত্বেও রাজ্য সরকার ছিল নীরব।

(চ) উপরন্তু কমিশনের বর্ধিত দামে সন্তুষ্ট হতে না পেরে সি-ই-এস-সি সহ রাজ্যের সব কয়টি বিদ্যুৎ সংস্থাকে হাইকোর্টে মামলা করতে সরকারই উৎসাহ দিয়েছে। শত অনুরোধ সত্ত্বেও রাজ্য সরকার হাইকোর্টে সি-ই-এস-সি'র বিরুদ্ধে মামলায় যোগ না দিয়ে ইন্ধন যুগিয়েছে সি-ই-এস-সি'কে। আজও চলছে রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদে আরো দাম বাড়াবার জন্য হাইকোর্টে মামলা।

(ছ) সুপ্রিমকোর্টের মামলাতেও রাজ্য সরকার থেকেছে অনুপস্থিত।

(জ) সুপ্রিমকোর্টের পরে রাজ্য বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ কমিশন তথাকথিত পারস্পরিক ভরতুকি তুলে দিয়ে সকলের দাম সমান করে দেবার কথা ঘোষণা করা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে ব্যাখ্যা চাইতে যায়নি, এমনকি কমিশনকেও সুপ্রিমকোর্টের ব্যাখ্যা চেয়ে নিতে নির্দেশ দেয়নি।

(ঝ) কমিশনের একতরফা অভিন্ন মাশুল ঘোষণার পরে গরিবের দুঃখে মায়াকান্না শুরু হয় রাজ্য সরকারের। কিন্তু ১৯৯৮ সালের কমিশন আইনের ৩৯নং ধারা প্রয়োগ করলেই যেখানে সমস্যা সমাধান সম্ভব, সেখানে সে সম্পর্কে নীরব থেকে কেন্দ্রের নীতিকেই কার্যকর করার ধূর্ত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে রাজ্য সরকার।

(ঞ) আমাদের এই বক্তব্যের সত্যতা পাওয়া যাবে সংবাদপত্রের রিপোর্টে। আনন্দবাজার পত্রিকায় (২০-১২-০২) প্রকাশিত হয়েছে, "কেন্দ্রীয় বিদ্যুৎ মন্ত্রক আজ আরও বলেছে, গত ৩ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, পারস্পরিক ভরতুকি প্রথা তুলে দেওয়া হবে। সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীও উপস্থিত ছিলেন। অতএব এটা স্পষ্ট যে পশ্চিমবঙ্গ এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে নয়।"

সুতরাং এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না যে, অত্যন্ত কৌশলে রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকারের বিশ্বায়নের নীতিকেই পশ্চিমবঙ্গে কার্যকর করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারি গদিতে টিকে থাকার জন্য জনসাধারণের ঘাড় ভেঙে টাকা আদায় করে, সেই টাকায় বহুজাতিক ও দেশীয় একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সুবিধা দেওয়ার যে দায়িত্বটি সি পি এম ফ্রন্ট সরকার অনায়াসে পালন করবে ভেবেছিল, এস ইউ সি আই-এর নেতৃত্বে লাগাতার আন্দোলনের চাপ তাতে বাধা সৃষ্টি করছে। এতেই দিশাহারা হয়ে কৌশলী ফ্রন্ট সরকার, শেষ আশ্রয় হিসাবে হাইকোর্টে মামলা করেছে নিজেরই মনোনীত বিদ্যুৎ কমিশনের বিরুদ্ধে, ঘোষণা করেছে প্রয়োজনে অর্ডিন্যান্স করেও জনস্বার্থ রক্ষা করার কথা। কিন্তু উত্তর দেয়নি, — প্রকৃত জনস্বার্থরক্ষায় কেন সরকার ৩৯নং ধারা প্রয়োগ না করে এই কঠিন লোকঠকানো পথ গ্রহণ করেছে। এখানেও রয়েছে কৌশলী বুদ্ধি। তাদের প্রকৃত লক্ষ্য, কেন্দ্রীয় সরকারের অভিন্ন মাশুল নীতিকেই এই রাজ্যে ধাপে ধাপে কার্যকর করা। ৩৯নং ধারা প্রয়োগ করলে সি পি এম ফ্রন্ট সরকারকে স্পষ্ট ঘোষণা করতে হবে যে, কমিশন যে অভিন্ন মাশুল নীতি নিয়েছে, সেটা জনস্বার্থবিরোধী। তার কিছুটা ভাল, কিছুটা খারাপ — এভাবে বলা যাবে না। এখানেই ৩৯ নং ধারা প্রয়োগের ক্ষেত্রে তাদের অসুবিধা। কোর্টে মামলা দায়ের করায় বা অর্ডিন্যান্স জারিতে এসব অসুবিধা নেই। আইনের ২৯(৩) ধারা প্রয়োগের নামে অনায়াসেই আপাতত ১ থেকে ৬০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ ব্যবহারকারী গ্রাহকদের বা ক্ষুদ্র গ্রাহকদের কিছুটা দাম কমিয়ে দেবার প্রচেষ্টা তাদের চলতে পারে। অন্যদিকে, তারা দেখছে হাইকোর্ট অথবা সুপ্রিমকোর্টের রায়ে যদি কাজ হাসিল হয়ে যায়, তাহলে তাদের পক্ষে জনদরদী সাজা যাবে। আর, যদি তা না হয় তাতেও নিজেদের আরও জনদরদী প্রমাণের সুযোগ এসে যাবে। সেক্ষেত্রে বিধানসভায় অর্ডিন্যান্স তৈরি করে আপাতত উপরোক্ত ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে। এবং এই সংগ্রামী চমকেই তরী পার করে দেওয়া যাবে আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনের। সরল জনগণকে আর একবার বোকা বানিয়ে বাজিমাতের এতবড় সুযোগ সি পি এম নেতৃত্ব ছাড়তে নারাজ, তাই হাইকোর্ট-সুপ্রিমকোর্ট-অর্ডিন্যান্সের হুঙ্কার।

আমাদের বুঝে নিতে হবে যে, হাইকোর্ট-সুপ্রিমকোর্টে মামলা বা অর্ডিন্যান্সের মধ্য দিয়ে অভিন্ন মাশুল নীতি প্রত্যাহারের কোনও সম্ভাবনা নেই, বা সরকার সেটা চাইছেও না। আন্দোলনকে দুর্বল করতে শাসকদলের এটা একটা ঘৃণ্য কৌশল ছাড়া আর কিছু নয়। একথা সত্য, আন্দোলনের চাপে এই কৌশলকারীদের কিছুটা পিছু হটতে হচ্ছে, সাময়িকভাবে হলেও কিছু ব্যবস্থা নিতে হচ্ছে। এটা নিশ্চয়ই এস ইউ সি আই-এর ধারাবাহিক আন্দোলনকে বাংলা বন্ধে রূপ দেওয়ারই ফল, যা শাসক দলকে কোণঠাসা ও দিশাহারা করেছে। এই আন্দোলনকে ধৈর্য ও সাহসের সাথে এগিয়ে নিয়ে গেলে, জনগণের জয় সম্পূর্ণ হতে পারে। এই লক্ষ্যেই সঠিক পদক্ষেপ হচ্ছে, অভিন্ন মাশুল নীতি সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের দাবিতে বাড়তি বিদ্যুৎ বিল বয়কট আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়া।

বন্ধ চটকল খুলতে হবে

এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ১৪ ফেব্রুয়ারি এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন —

"জগদ্দল জুট মিল কর্তৃপক্ষ ১৩ ফেব্রুয়ারি আগাম কোন নোটিশ না দিয়ে শুধুমাত্র নির্ধারিত মজুরি থেকেও কম বেতনে কাজ করতে শ্রমিকরা অস্বীকার করায় ৪ হাজার শ্রমিক নিযুক্ত এই মিলটিতে বেআইনি লক-আউট ঘোষণা করে দিয়েছে।

অবিলম্বে বিনাশর্তে জগদ্দল জুট মিল সহ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ নিউ সেন্ট্রাল জুট মিল এবং গৌরীপুর জুট মিলের লক-আউট প্রত্যাহার করতে প্রয়োজনীয় দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে দাবি করছি।"

প্রবীণ পার্টি সদস্যের জীবনাবসান

এস ইউ সি আই দলের উত্তর ২৪ পরগণার মছলন্দপুর আঞ্চলিক কমিটির বর্ষীয়ান সদস্য কমরেড নির্মল বিশ্বাস দীর্ঘদিন হৃদরোগে অসুস্থ থাকার পর গত ১২ জানুয়ারি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৪ বছর।

ষাটের দশকের শেষদিকে মছলন্দপুর অঞ্চলে দলের কাজকর্মের সূচনাপর্বে তিনি কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাকে সঠিক মনে করে জীবনের একমাত্র আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন। তারপর ধীরে ধীরে গোটা পরিবারকেও তিনি দলের সঙ্গে যুক্ত করেন। শুরু থেকেই তাঁর বাড়িটি ছিল দলের কর্মীদের কাছে এক নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল। তাঁর মধুর ও পিতৃসুলভ আচরণের মধ্য দিয়ে তিনি সকলের 'বড়দা' হিসাবে পরিচিত হয়েছিলেন।

গত ২৫ জানুয়ারি বিকাল ৪টায় বিশ্বাসহাটি পার্টি অফিসের সামনে তাঁর স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন লোকাল কমিটির বর্ষীয়ান সদস্য কমরেড নন্দদুলাল বিশ্বাস। উপস্থিত বহু কর্মী চোখের জলে কমরেড নির্মল বিশ্বাসের স্মৃতিচারণা করেন। বক্তব্য রাখেন জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড শঙ্কর ঘোষ। রাজ্য কমিটির সদস্য ও জেলা সম্পাদক কমরেড সদানন্দ বাগল কমরেড নির্মল বিশ্বাসের উচ্চ হৃদয়বৃত্তির কথা উল্লেখ করেন ও তাকে আত্মস্থ করে দলের আদর্শ ও শিক্ষানুযায়ী উপযুক্তভাবে বিপ্লবী কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সকলের কাছে আহবান জানান।

বি পি এল তালিকায় প্রকৃত গরিবদের নাম তোলার দাবিতে বিক্ষোভ

বাঁকুড়া জেলার বাঁকুড়া-১নং বিডিও অফিসে এস ইউ সি আই জগদল্লা লোকাল কমিটির নেতৃত্বে দেড় শতাধিক মানুষ ৪ ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভ অভিযান করে। বিক্ষোভ মিছিল থেকে এক প্রতিনিধিদল বিডিও'র কাছে ডেপুটেশন দিয়ে দাবি করে জগদল্লা অঞ্চলের ৯টি গ্রামের যে সব গরিব মানুষের নাম বি পি এল তালিকায় নেই তাদের নাম অন্তর্ভুক্ত করতে হবে ও কার্ড দিতে হবে। অবস্থাপন্নদের নাম বি পি এল তালিকা থেকে বাদ দিতে হবে। যে পরিবারের মাসিক আয় ৩০০০ টাকার মধ্যে তাদের বি পি এল তালিকার মধ্যে আনতে হবে। যাদের অন্ত্যোদয় ও অন্নপূর্ণা যোজনায় নাম ছিল তাদের অনেকের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, সেগুলি পুনরায় ঐ যোজনায় যুক্ত করতে হবে। বিডিও দাবিগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করেন এবং উপর মহলে স্মারকলিপির কপি পাঠাবেন বলে জানান। প্রতিনিধিরা বলেন, দাবিগুলি না পূরণ হলে প্রশাসনিক দপ্তর অবরোধ সহ অন্যান্য কর্মসূচিতে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

ভুটভুটির উপর করের বোঝা, আন্দোলনের প্রস্তুতি

সুন্দরবন অঞ্চলে সাধারণ মানুষের একমাত্র জল-পরিবহন ভুটভুটি। দূরপাল্লার যাত্রীবহনকারী ভুটভুটিগুলির উপর পাথরপ্রতিমা সি পি এম পঞ্চায়েত সমিতি কর বসিয়ে শুধু গত বছরই ৭৭,৭১৪ টাকা পুলিশ দিয়ে জোর করে আদায় করেছে। গরিব-নিম্নমধ্যবিত্ত ভুটভুটি মালিকরা নিজেরাই ভুটভুটিতে শ্রমিকের কাজ করেন। ফলে, এই বিপুল করের বোঝা বহন করা তাদের পক্ষে দুঃসাধ্য। আবার ভাড়া বাড়ালে তা গরিব যাত্রীদের পক্ষে দেওয়া অসম্ভব। এখানে উল্লেখ্য, সুন্দরবন এলাকায় একমাত্র পাথরপ্রতিমা সি পি এম পঞ্চায়েত সমিতিই এই ধরনের কর চাপিয়েছে, অন্য কোথাও তা নেই। গত ১০ ফেব্রুয়ারি সুন্দরবন যাত্রীবাহী ভুটভুটি অ্যাসোসিয়েশন-গুলির যৌথ সভায় এই কর আদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয়।

‘আমরা যুদ্ধ সমর্থন করিনা’ হলিউড জানাল বুশকে

নানা অনুষ্ঠান ও ফিল্ম উৎসবের মঞ্চ কে ব্যবহার করে হলিউডের চিত্র পরিচালক ও শিল্পীরা জর্জ বুশের ইরাক যুদ্ধের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে মুখ খুলেছেন। এঁদের মধ্যে অসকার পুরস্কার প্রাপকরাও রয়েছেন। এতে চিত্র প্রযোজকরা কিছুটা শঙ্কিত হলেও, শিল্পীরা বার্লিন আন্তর্জাতিক ফিল্ম উৎসব ও স্পেনের গোইয়া চিত্রশিল্প পুরস্কার অনুষ্ঠানকে যুদ্ধ বিরোধী মঞ্চ রূপে ব্যবহার করেছেন।

‘টুয়েন্টি ফিফ্‌থ আওয়ার’-এর পরিচালক স্পাইক লী, অভিনেতা এডওয়ার্ড নর্টন, রোজারিও ওসন এবং ব্যারি পেপার বার্লিনের উৎসবে এই ছবির মহরৎ অনুষ্ঠানে ইরাক নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান ভূমিকার সমালোচনা করেন। নর্টন বলেন — “আমার আশা বিশ্বের জনগণ ঐক্যবদ্ধ ভাবে মার্কিন সরকারের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টি করবে। ফ্রান্স ও জার্মানির জনগণের প্রতি আমার ঈর্ষা হয়। তাদের সঙ্গে আমি কথা বলেছি, তাদের সরকারের সঙ্গে যুক্তভাবে তারা এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে।” প্রখ্যাত অভিনেতা ডাসটিন হফম্যান বলেছেন, “আমি আমেরিকা বিরোধী নই, কিন্তু বর্তমান প্রশাসনের নীতির আমি বিরোধী।” ১ ফেব্রুয়ারি স্পেনের গোইয়া পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠান শেষপর্যন্ত যুদ্ধ বিরোধী সভায় পরিণত হয়। অনেকের বুকেই ছিল ‘যুদ্ধ নয়’ এই ব্যাজ এবং মুখে বুশবিরোধী ধিক্কার।

কবি নাট্যকাররাও রাজপথে

১৬ ফেব্রুয়ারি আমেরিকার কবি ও সাহিত্যিকরা যুদ্ধ বিরোধী মিছিলে হেঁটেছেন। এতে নেতৃত্ব দেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নাট্যকার আর্থার মিলার। (সংবাদসূত্র ঃ দি হিন্দুস্তান টাইমস্)

মানব ঢাল ঃ দলে দলে স্বেচ্ছাসেবকরা ইরাকে

ইরাকের উপর আমেরিকা ও ব্রিটেনের সম্ভাব্য আক্রমণ ঠেকানোর জন্য মানব ঢাল হবার ইচ্ছা নিয়ে ইউরোপ ও আমেরিকার শান্তিবাদীরা ইরাকে জড়ো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৩-২-০৩) আমেরিকা ও ইউরোপ থেকে আসা একদল শান্তি আন্দোলনের কর্মী তাদের দুটি বাহু দিয়ে টাইগ্রিস নদীর উপরকার একটি সেতুর থামগুলি আঁকড়ে দাঁড়িয়েছিল, উদ্দেশ্য ইরাকে আমেরিকার সামরিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতীকী মানব ঢাল তৈরি করা।

৬০ জনেরও বেশি মানব ঢাল-এর অপর একটি দল ১১ ফেব্রুয়ারি তুরস্কের আঙ্কারা থেকে বাসে চেপে ইরাক পাড়ি দেয়। বিশাল গাড়ির মিছিল তাদের এগিয়ে দিয়েছে।

ইরাকে সম্ভাব্য মার্কিন ও ব্রিটিশ হানাদারি ঠেকানোর জন্য ‘মানব ঢাল’ কর্মসূচির প্রধান উদ্যোক্তা হচ্ছেন ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধ ফেরৎ অবসরপ্রাপ্ত মার্কিন মেরিন সেনা কেনেথ নিকলস। তিনি বলেছেন, “আমার কৃতকর্মের (১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ) জন্য আমি ইরাকী জনগণের কাছে ক্ষমা চাইবো।” প্রথম দফায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা ২০০ জনের স্বেচ্ছাসেবক দলটি সম্পূর্ণ নিজেদের খরচে ২৬ জানুয়ারি একটি ডবল-ডেকার বাসে চেপে ইরাকে পাড়ি দিয়েছে। ৫০০০ কি মি দীর্ঘ রাস্তা পাড়ি দিতে গিয়ে দলটি প্যারিস, জেনেভা, জুরিখ, মিলান, বেলগ্রেড, সোফিয়া, ইস্তাম্বুল, আংকারা, দামাস্কাস, আম্মান ইত্যাদি শহরে হাজার হাজার মানুষের অভিনন্দন কুড়িয়ে ৮ ফেব্রুয়ারি বাগদাদে পৌঁছেছে। পথে সংগৃহীত হয়েছে ইরাকের মানুষের জন্য প্রচুর অর্থ, ওষুধপত্র ও শুকনো খাবার। (সংবাদসূত্র ঃ টাইমস অফ ইণ্ডিয়া ১৪-২-০৩ ও দি ডেকান হেরাল্ড, ২৭-১-০৩)

১৫ ফেব্রুয়ারি হলিউডে যুদ্ধ বিরোধী বিক্ষোভ

১৫ ফেব্রুয়ারি ফ্রান্সের মার্সেই শহরে বিক্ষোভ

১৫ ফেব্রুয়ারি জোহানেসবার্গে বিক্ষোভ

ওসামা টেপ ঃ

কালকের দানব আজ ত্রাতা

আসন্ন ইরাক যুদ্ধের আশঙ্কায় থমথমে পরিবেশে স্নিগ্ধ ব্যঙ্গ হয়ত নেহাতই বেমানান। যদি হৃদয়বিদারক অনুষঙ্গ ঘিরে না থাকত, তবে যা ঘটেছে তাকে মজার খোরাকই বলা যেত। আমরা ওসামার টেপের কথাই বলছি। নিজেদের মতলব হাসিল করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই টেপকে যেমন প্রবল আগ্রহে আঁকড়ে ধরেছে তাতে বলতে হয় গত বছরের দানব এ বছর ত্রাতার ভূমিকায়। পরিহাস এই যে আমেরিকা ওসামার এই টেপকে ওসামার বিরুদ্ধে নয়, কাজে লাগাচ্ছে ইরাকের বিরুদ্ধে। ২০০১ সালে যাকে ধরতে চাওয়া হয়েছিল ‘জিন্দা অথবা মুর্দা’, এখনও সে যে বহাল তবিয়তে বেঁচে আছে এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে হুংকার ছাড়ছে — তা নিয়ে আমেরিকার এতটুকু উদ্বেগ নেই। বরং সাদ্দাম হোসেনকে গেঁথে ফেলতে এবং ফ্রান্স ও জার্মানির বেসুরো কণ্ঠকে রুদ্ধ করতে লাদেনের মূল্য এখন আমেরিকার কাছে অনেক। টি ভি সম্প্রচারের একদিন আগেই টেপটি যেভাবে কলিন পাওয়েলের হাতেই এসে গেল — তাও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাথে সাথে পাওয়েল দুয়ে দুয়ে চার করে নিলেন ঃ ওসামার টেপে ইরাক এবং যুদ্ধের উল্লেখ প্রমাণ করে — অবশ্য প্রমাণের প্রয়োজন যদি আদৌ থাকে — সাদ্দামের সঙ্গে আল কায়দার যোগাযোগ রয়েছে। তাঁর ভাষায় — “গণবিধ্বংসী অস্ত্র প্রস্তুতকারী রাষ্ট্রের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের যোগসাজস আর নীরবে সহ্য করা যায় না.....”

কিন্তু এর একটা মজার দিকও আছে — যেটা পাওয়েল বা তাঁর সঙ্গীসাথীরা নিশ্চয় নজর করেননি। বিন লাদেন তার সাদ্দামবিরোধী তীব্র ঘৃণা কখনোই গোপন করেনি, টেপেও নয়। বরং ইরাকি একনায়ককে সে বাছা বাছা শব্দে ভূষিত করেছে, বলেছে — কমিউনিস্ট, সমাজতন্ত্রী, ধর্মদ্রোহী।

“সমাজতন্ত্রীরা সব ধর্মদ্রোহী”, টেপে ওসামা বলেছে, “দুনিয়ার যেখানেই তারা থাক, সে বাগদাদই হোক কিংবা এডেন, তারা নাস্তিক।” সেই সঙ্গে সে বলেছে সাদ্দামকে সমর্থন শুধু এই জন্যই যে তার শত্রু; মানে আমেরিকা, আরও বজ্জাত। আফগান যুদ্ধের ইতিহাস বলছে, তার এই মতামত সম্পর্কে আমেরিকা ভালমতোই ওয়াকিবহাল। কারণ, “নাস্তিক কমিউনিস্ট”দের বিরুদ্ধে এই বিদ্বেষই আফগান যুদ্ধে ওসামাকে মার্কিন শিবিরে টেনে এনেছিল। সাদ্দামের সঙ্গে আলকায়দার যোগসাজস বিশ্বের কাছে প্রমাণ করা যদি জরুরি হয় তবে ওসামার এই টেপ তার উল্টোটাই করবে। কলিন পাওয়েল সাদ্দামের বিরুদ্ধে সর্বশেষ যে অকাট্য প্রমাণ দাখিল করেছেন, উপগ্রহ থেকে তোলা ছবি সহ যা যা তিনি পেশ করেছেন, তা সবই এই টেপের মতোই মুখ থুবড়ে পড়েছে। ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের যে রিপোর্টটিকে তিনি “অসাধারণ” আখ্যা দিয়েছেন, এখন ফাঁস হয়ে গেছে যে সেটি একজন ডক্টরেট ছাত্রের থিসিস থেকে চুরি করা। এখানেই শেষ নয়। “উত্তর পূর্ব ইরাকের বিষ তৈরির ঘাঁটি’ বলে যে উপগ্রহ চিত্রটি দাখিল করা হয়েছে, টাইম অনলাইনের সাংবাদিকরা ধরে ফেলেছেন, সেটি আসলে “ভাঙাচোরা ময়লা ফেলা ধাপার মাঠ”। বুশ অ্যাণ্ড কোম্পানি যুদ্ধ করবেই এটা নিশ্চিত। তবে তাদের নতুন একদল পরামর্শদাতা জোগাড় করে যুদ্ধে নামা ভাল — যারা মিথ্যার বেসাতি করবে আরও পাকা খেলোয়াড়ের মতো।

(সম্পাদকীয় ঃ টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১৪-২-০৩)

১৫ ফেব্রুয়ারি এস ইউ সি আই-এর উদ্যোগে বিভিন্ন রাজ্যে যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ সভা ধিক্কার মিছিল সংগঠিত হয়। এখানে কেরালার ত্রিবান্দ্রম (বাঁদিকে) ও বিহারের মজঃফরপুরের ছবি দেওয়া হল।

বুর্জোয়া পার্লামেন্টারি রাজনীতির অনিবার্য পরিণতি আজকের দুর্বৃত্তায়ন

একের পাতার পর

তুলসীপাতা সাজার চেষ্টা করে। আইসমালির ঘটনায় দুই সি পি এম নেতার বহিষ্কার এর বেশি কিছু নয়। এই ঘটনায় সি পি এম নেতাদের জড়িত থাকার সংবাদে যদি এত হৈচৈ না হত, তাহলে কি ঐ দুই নেতা বহিষ্কৃত হত ? বহুদিনের লালন-পালনেই এই জাতের ক্রিমিনালরা তৈরি হয়েছে এবং নেতৃত্বের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহযোগিতায় এরা বহু অপকর্ম করার পরেও বহাল তবিয়তেই ছিল।

দমদমের দুলাল ব্যানার্জী বা শিলিগুড়ির বি ডি সিং-এর বিরুদ্ধে পুলিশী ব্যবস্থার কারণও সকলের জানা। সি পি এম দলের উচ্চ নেতৃত্বের ছত্রছায়ায় এরা দীর্ঘদিন ধরে নিজ নিজ এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল, নির্বাচনের সময় সি পি এম-কে মাস্‌ল পাওয়ার জুগিয়েছিল। তোলা আদায় বা তাদের ত্রাসের রাজত্বের পথের কাঁটাদের খুন-জখম ও নানাভাবে হয়রানি করা এবং এমনকি এলাকার আইন ও বিচার ব্যবস্থাকেও এরা নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছিল। ক্ষমতার মদমত্ততায় এরা যখন তাদের প্রভুদের (সি পি এম-এর উচ্চ নেতৃত্বের) নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছে এবং জনমনেও এই দুষ্কৃতকারী নেতাদের সম্পর্কে প্রবল প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়ে ক্ষোভ ফেটে পড়ার উপক্রম হয়েছে একমাত্র তখনই তাদের বিরুদ্ধে দল শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কথা ঘোষণা করেছে এবং নিজেরা শুদ্ধিকরণের চ্যাম্পিয়ান হওয়ার চেষ্টা করেছে। না হলে, সি পি এম দল সৃষ্ট, নিযুক্ত এবং অনুগত সমাজবিরোধীদের তারা সবসময়ই যত্নের সাথে লালনপালন করেছে এবং প্রমোশন দিয়েছে।

এছাড়া বর্তমান এই পুঁজিবাদী সমাজে নানা কারণে সমাজবিরোধীদের সৃষ্টি হয়। এই সমাজবিরোধীরা কোন্ দলের ছত্রছায়ায় থাকার চেষ্টা করে? যারা সরকারি ক্ষমতায় আছে, পুলিশ প্রশাসন যে দলের কন্ট্রোলে, যে দলের নেতাদের প্রশাসনের উপর প্রভাব প্রতিপত্তি আছে; অথবা যাদের ক্ষমতায় যাওয়ার সম্ভাবনা আছে বা কেন্দ্রে বা রাজ্যে যারা ক্ষমতার অংশীদার, তাদের কাছেই সমাজবিরোধীরা আশ্রয় খোঁজে। কারণ, তারাই একমাত্র সমাজবিরোধীদের নিরাপত্তা দিতে পারে। সেইদিক থেকে সি পি এম আজ পশ্চিমবাংলায় সমাজবিরোধী-দের কাছে সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয়। সি পি এম-এরও এদের প্রয়োজন বিরোধী শক্তিকে শায়েস্তা করার জন্য, প্রয়োজনে নিশ্চিহ্ন করার জন্য, ভোটের সময় সন্ত্রাস সৃষ্টি ও রিগিং করার জন্য। বেকায়দায় পড়ে দু'একজনকে বহিষ্কার করলেও তার দ্বারা সি পি এম দলের সমাজবিরোধী মুক্ত হওয়ার উপায় নেই। পশ্চিমবাংলার সমস্ত এলাকায় এমন শত শত শহিদুল কারিগর, সুবল বাগচী পাওয়া যাবে। এদের সবাইকে বহিষ্কার করলে সি পি এমের 'ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়' হয়ে যাবে।

বেশ কয়েক বছর আগে বৌবাজার বোমা বিস্ফোরণ কাণ্ডের নায়ক রশিদ খানের সমাজবিরোধী কার্যকলাপের সঙ্গে সি পি এমের প্রথম সারির মহিলা নেত্রী শ্যামলী গুপ্তের নাম জড়িয়ে দলের ল্যাজে-গোবরে অবস্থা হওয়ার ফলে দল শ্যামলী গুপ্তকে ছয় মাসের জন্য 'লোক-দেখানো সাসপেন্ড' করেছিল। ঘটনার স্মৃতি না মুছতেই সেই বহিষ্কৃত নেত্রীকে স্বপদে বসিয়েছে এবং তারপর বহুদূর পর্যন্ত তার প্রমোশন হয়েছে। ঐ একই ঘটনায় সাসপেন্ড হওয়া বিধায়ক লক্ষ্মী দে আজ সি পি এমের মুখ্য সচেতক। উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বাগদা-র ত্রাস বুল্টনের বিরুদ্ধে ঐ জেলার স্বয়ং পুলিশ সুপার হরিসেন বর্মা ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু বুল্টনের হাত অনেক লম্বা হওয়ায় ঐ জেলার সি পি এম সম্পাদক নিজেই বুল্টনকে রক্ষা করতে আসরে নামেন। সি পি এম জেলা সম্পাদকের কথা মত কাজ না করায় শেষপর্যন্ত পুলিশ সুপারকেই পরাজিত হতে হয় এবং বাস্তবে 'পানিশমেন্ট ট্রান্সফার' নিয়ে জেলা থেকে বিদায় নিতে হয়। নারায়ণ বিশ্বাস ও সুশান্ত ঘোষের নামে দীর্ঘদিন ধরে খুন ও নানা অপরাধ-মূলক কাজের অভিযোগ থাকলেও সি পি এম এদের মন্ত্রীপদ দিতে দ্বিধা করেনি। বরং গুণ্ডাবাহিনী নিয়ে বিরোধীদের শায়েস্তা করতে এরা ঐ দলে 'সম্পদ' হিসাবেই গণ্য হন।

নদীয়ার চাপড়া জোনাল কমিটির নেতা বংশীবদন মজুমদারের দু'বছর আগে এক অপরাধে জেলে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু, অপরাধ করে সি পি এম আমলে সি পি এম নেতা জেল খাটবে — এ কেমন কথা! পুলিশ প্রশাসন তো তার হাতের মুঠোয়। তাই তিনি অন্য একজনকে মজুরি দিয়ে পাঠালেন তার হয়ে জেলটা খেটে দিতে। অবশেষে ব্যাপারটা ফাঁস হয়ে যাওয়ায় তিনি বললেন, এতসব কাণ্ড নাকি তিনি জানতেনই না। এতবড় অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও তার প্রমোশন কিন্তু আটকায়নি। ছিলেন জোনাল কমিটির নেতা, ঐ ঘটনার পর সি পি এমের জেলা সম্মেলনে তিনি হয়েছেন জেলা কমিটির অন্যতম নেতা, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। এবার তিনি সরকারি প্রশাসনকে কিভাবে ব্যবহার করতে চেষ্টা করবেন তা অনুমান করতে অসুবিধা হয় কি?

বানতলা ও বিজন সেতু সহ বহু কাণ্ডে কান্তি গাঙ্গুলীর নাম জড়িত থাকলেও কোনও এক অদৃশ্য হাতের ইশারায় পুলিশের দেওয়া চার্জশীটে বার বার তার নাম বাদ পড়ে গিয়েছিল জ্যোতি বসুর আমলে। বানতলার ঘটনাকে 'এমন তো কতই ঘটে' বলে লঘু করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন স্বয়ং তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী। সি পি এম-এর তাবড় নেতাদের আনুকূল্যে পুলিশকে 'বগলদাবা' করে কান্তি গাঙ্গুলী পুরোপুরি অব্যাহতি পান ঐ সব মামলা থেকে। সেইসঙ্গে প্রমোশন পেয়ে কলকাতা পৌরসভার মেয়র পরিষদের সদস্য হন। এস ইউ সি আই দলের দক্ষিণ ২৪ পরগণার সংগঠন ভাঙার দায়িত্ব দেওয়া হয় ঐ কান্তি গাঙ্গুলীকেই। কান্তি গাঙ্গুলী ঐ জেলার পুলিশ-প্রশাসনকে সম্পূর্ণ কন্ট্রোল করে যত দাগী আসামী, ডাকাত, খুনী, নারী পাচারকারীদের নিয়ে এস ইউ সি আই নেতা-কর্মীদের খুন করার জন্য ক্রিমিনাল বাহিনী গঠন করেছেন। তিনি তার নিজস্ব ক্রিমিনাল বাহিনী দিয়ে খুন করিয়েছেন এস ইউ সি আই দলের রাজ্য কমিটির সদস্য ও তেভাগা আন্দোলনের প্রবীণ নেতা সর্বজনশ্রদ্ধেয় কমরেড আমীর আলী হালদারকে, খুন করিয়েছেন জেলার অন্যতম নেতা হাসেম খাঁ, অশোক হালদার সহ বহু নেতা-কর্মীকে। এস ইউ সি আই দলের সংগঠিত গ্রামে লুঠ, ডাকাতি, নারীর সম্ভ্রমহানি সহ নানা অপরাধের মূল পাণ্ডা ঐ কান্তি গাঙ্গুলী। কুলতলি থানার মৈপীঠ গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কিছু কর্মীকে ঐ ক্রিমিনাল বাহিনী খুন করেছে, লক্ষ লক্ষ টাকা লুঠ করেছে, বহু মা-বোনের ইজ্জতহানি করেছে। এই খুনী বাহিনী গত ১৪ বছর ধরে মৈপীঠ গ্রাম পঞ্চায়েতের সকল ভোটেই বুথ দখল করে রিগিং করে, এস ইউ সি আই এজেন্টদের পুলিশের উপস্থিতিতেই মারধর করে বের করে দেয়। জনমানসে তিনি ধিকৃত হলেও দুর্বৃত্তের রাজনীতিতে তিনি সি পি এম দলের সম্পদ। তাই তিনি আজ প্রমোশন পেয়ে সি পি এম ফ্রন্ট সরকারে মন্ত্রীপদ আলোকিত করে বসে আছেন।

আইসমালির ঘটনা দেখিয়ে দিল, তাদের দলেরই পাল্টা গোষ্ঠীকে শায়েস্তা করতে সি পি এম দল কত নিচে নামতে পারে। বিরোধী দলকে নির্মূল করার চেষ্টায় তারা আরো কত হিংস্র হতে পারে তা এই ঘটনা থেকে খানিকটা হলেও অনুমান করা যায় — যা একটার পর একটা ঘটনায় বহু মূল্য দিয়ে প্রতিমুহূর্তে উপলব্ধি করছেন জয়নগর, কুলতলি, গড়বেতার মানুষ।

সি পি এম দলের নিচু তলার যে সমাজবিরোধীদের নাম জনসমক্ষে এসে যাচ্ছে তাদের অনেকেই সাধারণ গরিব, অনেকে নিম্নমধ্যবিত্ত-মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। ঐ দলের আদর্শহীন, সুবিধাবাদী, স্বার্থপর ও দুর্বৃত্তায়নের রাজনীতির সুবাদে তারা আজ সমাজবিরোধী। নেতাদের প্রশ্রয়ে ও খুঁটির জোরে সমাজবিরোধী কাজের ধারাবাহিকতায় তারা আজ বেপরোয়া। কোনো ঘটনায় সাধারণ মানুষ যখন দল সম্পর্কে 'ছি ছি' করতে থাক, যখন আর রেখে ঢেকে সামাল দেওয়া যায় না, তখন নেতারা বেকায়দায় পড়ে তাদের অধীনস্থ সমাজবিরোধীদের 'বলির পাঁঠা' করতেও কুণ্ঠিত হয় না। ডাকাতি, খুন, নারী নির্যাতনের দায়ে তারা ধরা পড়ে, জেলে যায়, দল থেকে বহিষ্কৃত হয়। কিন্তু যাদের প্রশ্রয়ে ও পরিচালনায় তারা ঐ কাজ করে আসছিল, যারা শত খুনের নায়ক, যারা ক্রিমিনালদের জন্মদাতা শতগুণ বড় ক্রিমিনাল, তারা কিন্তু সি পি এম দলে নেতৃত্বের পদ আলোকিত করে বহাল তবিয়তে থাকছে এবং থাকবে। তাই, ঐ দলে সমাজ-বিরোধীদের স্থান নেই — একথা সত্য নয়। সমাজবিরোধীদের 'লম্বা হাত' থাকলে, খুঁটির জোর থাকলে, দল দ্বারা নিযুক্ত হলে এবং ক্ষমতা-সীন গোষ্ঠীর অনুগত হলে সি পি এম দলে তার প্রমোশন ঠেকায় কে! আজ সংগ্রামী বামপন্থার আদর্শচ্যুত ও গদিসর্বস্ব রাজনীতিতে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে সি পি এম নেতৃত্ব একদিকে ক্রিমিনাল-নির্ভর হচ্ছে, অন্যদিকে এই দলেরই নিচুতলার বহু কর্মী, যারা এখনও কমিউনিজমের প্রতি আবেগ ও সংগ্রামী বামপন্থার

সাতের পাতায় দেখুন

ধানতলায় ডাকাতি ও নারী নির্যাতনের ঘটনায় ধিক্কার জানিয়ে মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহ্বানে গত ১১ ফেব্রুয়ারি এক বিক্ষোভ মিছিল সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে শুরু হয়ে রানি রাসমণি রোডে যায়। মিছিলে নেতৃত্ব দেন সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদিকা কমরেড ছায়া মুখার্জী, রাজ্য সম্পাদিকা কমরেড সাধনা চৌধুরী ও কলকাতা জেলা সম্পাদিকা কমরেড হাসি হোড়।

মালিকশ্রেণীকে ভরতুকি দিতে সরকারের টাকার অভাব হয়না

কেন্দ্রীয় বাজেটের দিন ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে কী কী হতে পারে তা নিয়ে নানা প্রস্তাব তোলা ও জল্পনা কল্পনা শুরু হয়েছে। এর মধ্যে কোন্‌গুলি গৃহীত হবে আর কোন্‌গুলি বাদ যাবে তা নিশ্চিতভাবে বলা না গেলেও, মন্ত্রী-আমলাদের ভাবনাচিন্তার মধ্যে সরকারের জনবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গিটা স্পষ্টই বেরিয়ে এসেছে। ভাবনাচিন্তাগুলি খুঁটিয়ে দেখলে দুটো পরিষ্কার ভাগ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। একদিকে রয়েছে পুঁজিপতিশ্রেণীকে আরও বেশি কর ও সুদ ছাড় এবং ভরতুকি দেওয়ার প্রস্তাব, অন্যদিকে রয়েছে পরিকল্পনা ব্যয়, মুলধনী খাতে এবং শিক্ষা প্রভৃতি খাতে ব্যয় হ্রাসের প্রস্তাব।

ঠিক বাজেটের আগেই বলা শুরু হয়েছে ভারতে কর্পোরেট ট্যাক্স, ক্যাপিটাল গেইনস ট্যাক্স নাকি অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি। সাথে সাথে এও বলা হচ্ছে আমদানি শুল্ক ৭ থেকে ৮ শতাংশ কমানো হবে। সাধারণ গৃহস্থদের জন্য বিদ্যুতের দাম বেপরোয়াভাবে বাড়ানো হচ্ছে অথচ বৃহৎ শিল্পসংস্থা নিজের প্রয়োজনে নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন যন্ত্র বসালে তার উপর কর ছাড় দেওয়া হচ্ছে। খাদ্যে ভরতুকি দেওয়া হচ্ছে বটে, তবে তা দিয়ে রেশনে খাদ্যশস্যের দাম কমানো হচ্ছে না। কিছুদিন আগেই গমের সরকারি ক্রয়মূল্য বাড়ানো হয়েছিল, এখন তৈলবীজের ক্রয়মূল্য কুইন্টাল প্রতি ৩০ টাকা, মসুর ও ছোলার দাম কুইন্টাল প্রতি ২০ টাকা বাড়ানো হয়েছে। অর্থাৎ কৃষি পুঁজিপতিদের কাছ থেকে খাদ্যশস্য কেনার সরকারি ক্রয়মূল্য বাড়িয়ে ভরতুকির টাকা দিয়ে ধনী চাষির পকেট ভারি করছে বিজেপি সরকার। অন্যদিকে মানবসম্পদ উন্নয়ন দপ্তর বলেছে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে ১০ শতাংশ আয় বাড়াতে হবে। সংবাদে এও প্রকাশ যে, আসন্ন বাজেটে অর্থমন্ত্রী যেভাবে যোজনা খাতে ব্যয়বরাদ্দ ছেঁটে দিয়েছেন তাতে কেন্দ্রেরই তিন মন্ত্রী যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যানকে লিখিতভাবে উদ্বেগ জানিয়েছেন। শিক্ষামন্ত্রী পর্যন্ত বলেছেন এভাবে বরাদ্দ কমালে, 'সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা' এবং 'মিড ডে মিল' প্রকল্প চালানো যাবে না। এমনিতেই সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষার নামে চলছে ডি পি ই পি। মিড ডে মিল প্রায়শই থাকে না বা যা থাকে তার মান পশুখাদ্যের কাছাকাছি। এখন তাতেও কোপ পড়তে চলেছে। অথচ দু-বেলা সরকার বলছে দেশের আর্থিক বনিয়াদ মজবুত, রপ্তানি বাড়ছে, বিদেশি মুদ্রার ভাণ্ডার উপচে পড়ছে — ইত্যাদি।

সরকারি ভরতুকি ছাঁটাইকে এখন একটা 'তত্ত্বগত' চেহারা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার গত বছর মোট ভরতুকি দিয়েছে ৩৯৮০১ কোটি টাকা (দ্রঃ আনন্দবাজার, ৩০-১-০৩), যা স্বনামে বেনামে সামরিকখাতে খরচের (৮০,০০০ কোটি) অর্ধেক, মোট জাতীয় উৎপাদনের ২ শতাংশেরও কম। যে সরকার মালিকশ্রেণীর জন্য করছাড়ের দানছত্র খুলেছে এটুক ভরতুকিও তারা দিতে নারাজ।

শিক্ষা, চিকিৎসা, বিদ্যুৎ, সার প্রভৃতি অত্যাবশ্যক পণ্য ও পরিষেবা ক্ষেত্রে সরকারি দায়িত্বের প্রশ্ন উঠলেই বাজার অর্থনীতির, অর্থাৎ পুঁজিবাদের প্রবক্তারা বলেন — রাজনীতি অর্থনৈতিক নীতি নির্ধারণ করছে বলে, রাজনৈতিক দলগুলি ভোটের স্বার্থে 'জনমোহিনী' নীতি নেওয়ায় সংস্কারের কাজ মার খাচ্ছে, উন্নয়ন আটকে যাচ্ছে। তাই অর্থনৈতিক বিষয়গুলি বাজারের নিয়মের ওপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। জনকল্যাণমূলক ক্ষেত্রে সরকারের কেন ভরতুকি দেওয়া উচিত নয় তা বোঝাবার জন্য তাঁরা একটা তত্ত্ব খাড়া করেছেন। সেই তত্ত্ব বলছে জনগণকে সবকিছুই, এমনকি শিক্ষা-চিকিৎসাও বাজারের দামে কিনতে হবে। সরকার হস্তক্ষেপ করে কোন জিনিসের দাম কমিয়ে রাখবে না। আইন করে বা ভরতুকি দিয়ে অত্যাবশ্যক পরিষেবার দাম কমিয়ে রাখাটা এঁদের মতে অন্যায়।

ভরতুকিবিরোধী লবির এখন রমরমা। কর-দর বৃদ্ধির ফলে যে গরিব ও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় সবচেয়ে অসুবিধার মধ্যে পড়ছে, ভরতুকিবিরোধী লবির একটানা একপেশে প্রচারে তাঁরাও অনেকাংশে বিভ্রান্ত হচ্ছেন। ফলে হাটে বাজারে, বাসে-ট্রামে মাঝে মাঝেই শোনা যায়, 'চিরকাল ভরতুকি দেওয়াটা কোন ব্যবস্থাই হতে পারে না।'

প্রশ্ন হল, তাঁদের প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী অর্থনীতিকে পুরোপুরি বাজারের ওপর ছেড়ে দিলে গরিব মধ্যবিত্ত না হয় মরবে, কিন্তু মালিকশ্রেণী বাঁচবে তো? এর উত্তর বাঁচবে না। সেই কারণেই দেখা যায়, মালিকশ্রেণীর স্বার্থে সরকার অর্থনীতিতে হস্তক্ষেপ করছে। এক্ষেত্রে ভরতুকিবিরোধী হস্তক্ষেপবিরোধী লবি কিন্তু অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের উপর রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নও তুলছে না। এই মালিকমোহিনী নীতিকে তারা 'বাস্তবতা' বলে চালাচ্ছে। কীভাবে সরকার মালিকশ্রেণীর স্বার্থে অর্থনীতিতে হস্তক্ষেপ করছে, তা এবার দেখা যাক।

আমরা গণদাবীর ৫৫ বর্ষ, ২১ (৩.১.০৩) সংখ্যায় দেখিয়েছি, বিদেশি মুদ্রার যে বিরাট মজুত ভাণ্ডার দেখিয়ে বিজেপি সাফল্যের ঢোল পেটাচ্ছে তা আসলে আয় নয়, দায়; সমৃদ্ধির নয়, সঙ্কটেরই পরিচায়ক। কারণ, এই ভাণ্ডারের বিরাট অংশই ঋণ বা আমানত যার জন্য সরকারকে সুদ দিতে হবে। আর এই সুদের টাকার সিংহভাগই শেষপর্যন্ত আদায় করা হবে জনগণের পকেট কেটে। অথচ, বিপুল পরিমাণ এই বিদেশি মুদ্রা কার্যত অলস পুঁজির ভাণ্ডার। মন্দার ফলে সরকার এই অর্থ বিনিয়োগের পথ পাচ্ছে না। বিশ্বায়নের অঙ্গ হিসাবে দেশের অভ্যন্তরে বিদেশি মুদ্রার আসা এবং দেশ থেকে বাইরে যাওয়ার ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হয়েছে। অর্থাৎ বিদেশি মুদ্রার চলাচল অনেক সহজ হয়েছে। তাছাড়া ইউরোপীয় ব্যাঙ্কের তুলনায় ভারতে বিদেশি মুদ্রা রাখলে সুদ বেশি পাওয়া যায়। কাজেই বাড়তি সুদের লোভে অনাবাসী ভারতীয়দের মধ্যে 'দেশপ্রেমের' জোয়ার দেখা দিয়েছে। 'শিকড়ের সন্ধানে' তারা ভারতে ডলার পাঠাচ্ছে। খোলা বাজারের পয়লা নম্বর সমর্থক আনন্দবাজার পত্রিকা ১৫ জানুয়ারি সম্পাদকীয়তে লিখেছে — "কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক এই মুদ্রা নিরাপদ সম্পদে বিনিয়োগ করিয়া থাকে এবং এই বিনিয়োগের প্রাপ্তিযোগ ৩ শতাংশের সামান্য ঊর্ধ্বে। অথচ অনাবাসী ভারতীয়দের জমা প্রকল্পের মাধ্যমে ভারত বিদেশি ঋণ গ্রহণ করিয়াছে ১০ শতাংশের অধিক হারে।" তাহলে কি দেখা যাচ্ছে? দেখা যাচ্ছে, বিদেশি ঋণে ১০ শতাংশ সুদ সরকার দিচ্ছে অথচ এই মুদ্রা নিরাপদ সম্পদে বিনিয়োগ করে পাচ্ছে মাত্র ৩ শতাংশ। অর্থাৎ এক্ষেত্রে ভরতুকি দাঁড়াচ্ছে ৭ শতাংশ। প্রশ্ন হল কেন সরকার এত ভরতুকি দিয়ে বিদেশি মুদ্রার বিপুল ভাণ্ডার ধরে রেখেছে?

বিষয়টা একটু ভেঙে দেখা যাক। সকলেরই নিশ্চয় মনে আছে, কয়েক বছর আগে যখন সরকার দফায় দফায় টাকার অবমূল্যায়ন করছিল তখন বাজার অর্থনীতির প্রবক্তারা বলেছিল, আসলে টাকার দাম কমেই গিয়েছে, সরকারের উচিত তাকে স্বীকৃতি দেওয়া। এই যুক্তিতে সরকার একাধিকবার টাকার দাম কমিয়ে দেয়, ফলে পেট্রল ডিজেল কেরোসিন সহ বিদেশ থেকে আমদানি করা সমস্ত পণ্যের দাম বেড়ে যায়। মূল্যবৃদ্ধির বোঝা এসে পড়ে সাধারণ মানুষের ঘাড়ে। বাজার অর্থনীতির যেসব প্রচারকরা তখন সরকার কর্তৃক টাকার অবমূল্যায়নের সমর্থনে কথা বলেছিল — এখন তারা নীরব। কারণ টাকার মূল্য বেড়ে গেলে টাকার অঙ্কে বিদেশ থেকে আমদানি পণ্যের দাম কমবে। ভারতে বিদেশ থেকে আমদানিকৃত পণ্যসমূহের মধ্যে প্রধান হল পেট্রল ডিজেল কেরোসিন। এগুলির দাম কমে যাবে। ডলারের দাম পড়ে গেলে ডলার বিক্রয়কারী শক্তিশালী ব্যবসায়ী গোষ্ঠী সঙ্কটে পড়বে, আর বিদেশে ভারত থেকে রপ্তানি করা পণ্যের দাম বেড়ে যাবে। এমনিতেই ভারতবর্ষের রপ্তানির তুলনায় আমদানি বেশি। তার ওপর রপ্তানি পণ্যের দাম বেড়ে গেলে রপ্তানিকারক পুঁজিপতিদের মুনাফায় টান ধরবে।

আর্থিক সংস্কারের সুফল দেখাতে বিজেপি এখন সংখ্যাতত্ত্বের কৌশলে দেখাচ্ছে চলতি আর্থিক বছরের প্রথম ছ'মাসে রপ্তানি বৃদ্ধির হার বেড়েছে। হারের হিসেবের চালাকিটা হল এইরকম, আমদানি যদি ১০ টাকা থেকে বেড়ে ১৫ টাকা হয় তবে বৃদ্ধির হার ৫০ শতাংশ, রপ্তানি যদি ১ টাকা থেকে বেড়ে ২ টাকা হয় তবে বৃদ্ধির হার ১০০ শতাংশ। এইরকম চালাকির দ্বারা জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা হয়ত করা যায় কিন্তু রপ্তানি পণ্যের উৎপাদক শিল্পপতিগোষ্ঠীকে আশ্বস্ত করা যায় না। তারা জানে এসব সংখ্যাতত্ত্বের চালাকি। তারা এও জানে যে, এই তথাকথিত সাফল্য বাস্তবের ওপর নয়, চোরাবালির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। সরকার যদি ক্রমাগত ডলার কিনে আটকে না রাখে তাহলে তাদের মুনাফায় টান পড়বে।

কেন্দ্রীয় সরকারও ক্রমাগত কল্যাণমূলক খাতগুলিতে খরচ কমিয়ে একচেটিয়া মালিকদের স্বার্থে নানাভাবে শত শত কোটি টাকা মালিকদের ভরতুকি দিচ্ছে। মালিকগোষ্ঠীর স্বার্থে রচিত অর্থনৈতিক সংস্কার নীতির ভুয়ো সাফল্য দেখিয়ে ভোট টানতেও কোটি কোটি খরচ করছে। তথাকথিত বাজার অর্থনীতির প্রচারক অর্থনীতিবিদেরাও এর বিরুদ্ধে কিছু বলছেন না, কারণ চূড়ান্ত বিচারে তারাও পুঁজিবাদেরই রক্ষক। বাজার অর্থনীতির মোড়কে পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার এই রাজনীতিকে, চালাকিকে, প্রতারণাকে জনসাধারণকে বুঝতে হবে এবং বুঝে এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে।

রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন

ছয়ের পাতার পর

প্রতি আকর্ষণ বিসর্জন দিতে পারেননি, তারা অনেকেই দলের এই শোচনীয় পরিণতি দেখে বেদনায় হতাশায় ধুঁকছেন, নিষ্ক্রিয় হচ্ছেন, বা দলে কোণঠাসা হয়ে আছেন।

সি পি এম আজ যে রাজনীতির চর্চা করছে এটাই তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। শুধু সি পি এম কেন, ক্ষমতায় বসে আজকের চূড়ান্ত অবক্ষয়ী পুঁজিবাদকে যারাই টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করবে, যেনতেন-প্রকারেণ পুঁজিপতিদের তুষ্ট করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চাইবে তাদের সকলের ক্ষেত্রেই একথা সত্য। সারা বিশ্বেই পুঁজিবাদের সাথে দুর্নীতি, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন আজ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে গেছে, ভারতবর্ষও তার ব্যতিক্রম নয়। তাই পুঁজিপতিশ্রেণীর চিহ্নিত দল কংগ্রেস, তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি কোনমতেই জনগণের বিকল্প হতে পারে না। তারাও যে যেখানে ক্ষমতায় আছে সেখানে একই আচরণ করে চলেছে।

আজ যেখানে পুঁজিবাদের সর্বাত্মক অবক্ষয়ের যুগে বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারী রাজনীতির অনিবার্য পরিণতি ক্রিমিনালাইজেশন অব পলিটিক্স, সেখানে একমাত্র উন্নত নৈতিকতার আধারে গড়ে-ওঠা মার্কসবাদী সর্বহারা বিপ্লবী রাজনীতি পরিচালিত শ্রেণীসংগ্রাম ও গণআন্দোলনই সামাজিক অপরাধের দূষণ থেকে মুক্ত পরিচ্ছন্ন, সুস্থ ও কার্যকরী রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে।

MM & PO /WB / RNP 288/2003 R. No 5268 / 60

গণদাবী ৫৫ বর্ষ / ২৭ সংখ্যা

দিল্লিতে বিক্ষোভ সমাবেশ

কেন্দ্রের এন ডি এ জোট সরকারের জনবিরোধী নীতির প্রতিবাদে গত ১০ ফেব্রুয়ারি দিল্লির পার্লামেন্ট ভবনের সামনে এস ইউ সি আই এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করে। বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ জোট সরকারের আর্থিক ও সামাজিক নীতিগুলি যেভাবে শ্রমিকশ্রেণীর কষ্টার্জিত অধিকার একের পর এক খর্ব করছে, বেকারত্বের হার দ্রুতগতিতে বাড়িয়ে তুলছে, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার ব্যবসায়ীকরণ করছে, কৃষিতে ব্যবহৃত বিদ্যুতের ওপর থেকে ভরতুকি তুলে দিচ্ছে, সেচ-বীজ-সার-ডিজেল ইত্যাদি কৃষি উপকরণের দামের বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে, ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে কৃষিজ উৎপাদনের সরকারি সংগ্রহের পরিমাণ কমিয়ে কৃষিজীবী সহ সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলছে এবং সেইসঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়িয়ে, দুর্নীতি-কুরুচি-অশালীনতা ও সন্ত্রাস ছড়িয়ে, মহিলাদের প্রতি বিভেদাত্মক মনোভাবের বৃদ্ধি ঘটিয়ে এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সমাজজীবনে সর্বব্যাপক সর্বনাশ ডেকে আনছে, এই বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত হয় তারই প্রতিবাদে।

ঐ দিন পাঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থান, দিল্লি ও মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে হাজার হাজার এস ইউ সি আই কর্মী প্রথমে রামলীলা ময়দানে জমায়েত হন। সেখান থেকে একটি সুসজ্জিত সুশৃঙ্খল মিছিল পার্লামেন্ট ভবনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। পার্লামেন্ট স্ট্রীটে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন পার্টির রাজস্থান রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড গিরিজেশ্বর সিং, হরিয়ানা রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড সত্যবান, দিল্লি রাজ্য সংগঠনী কমিটির সম্পাদক কমরেড প্রতাপ শামল, পাঞ্জাবের ইউনিট ইন-চার্জ কমরেড অবতার সিং এবং মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের গুনার ইউনিট ইন-চার্জ কমরেড সুনীল গোপাল। বক্তারা প্রত্যেকেই সরকারি নীতির সম্মিলিত আক্রমণের উল্লেখ করে বলেন, সংসদীয় রাজনৈতিক দলগুলি শোষক পুঁজিপতিশ্রেণীর সেবা করতে গিয়ে জনজীবনের এই মূল সমস্যাগুলির দিক থেকে মানুষের দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে এবং ক্ষমতার মসনদে টিকে থাকা এবং অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য জাতপাত, সাম্প্রদায়িকতা এবং ধর্মান্ধতার বিষ ছড়িয়ে চলেছে। এই সভায় আমেরিকার ইরাক আক্রমণের ছকের বিরুদ্ধে একটি নিন্দাপ্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

পার্লামেন্ট ভবনের দিকে এগিয়ে চলা এস ইউ সি আই-এর বিশাল মিছিলের একাংশ

পরে হরিয়ানার কমরেড সত্যবান, দিল্লির কমরেড জে এন মণ্ডল, পাঞ্জাবের কমরেড ইন্দর সিং এবং কমরেড লোকেশ শর্মার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। স্মারকলিপিতে সরকারের কাছে কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী এবং ক্ষুদ্র ও মধ্যচাষীর স্বার্থরক্ষাকারী আর্থিক নীতি গ্রহণের দাবি জানানো হয়। খরাপীড়িত অঞ্চলে সময়োপযোগী প্রয়োজনীয় ত্রাণ পাঠানো, সকলের জন্য রেশনিং-এর ব্যবস্থা করা, উন্নতমানের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা করা এবং সাধারণ মানুষের ওপর কর বৃদ্ধি না করে বৃহৎ শিল্পপতি মহলের ওপর বর্ধিত হারে কর চাপানো এবং নারী নির্যাতন বন্ধের দাবিও জানানো হয় স্মারকলিপিতে।

বাগদাদে আন্তর্জাতিক সম্মেলন

একের পাতার পর

ভিয়েতনামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিধ্বংসী ও রাসায়নিক মারণাস্ত্র ব্যবহারের পরিণাম সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেওয়ার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে তিনি বলেন — গণবিধ্বংসী অস্ত্র, বিশেষ করে যে অস্ত্রে তেজস্ক্রিয় পদার্থ ব্যবহার করা হয়, তা বহু বছরের জন্য পরিবেশকে বিষাক্ত করে। ভিয়েতনাম যুদ্ধ ফেরত মার্কিন সৈন্য, যারা ভিয়েতনামী মহিলাদের বিবাহ করে দেশে ফিরেছিল, তাদের সন্তানদের অনেকেই বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মেছিল। তারা আদালতে ক্ষতিপূরণের দাবি করায় আদালত আন্তর্জাতিক কমিশন গঠন করে। সেই কমিশনের সদস্য হিসাবে আমি দেখেছি, আমেরিকা 24D নামে একটা পাতা ঝরানো বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করেছিল যার ফলে বিশাল বনভূমি পুরো বন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল। শহরাঞ্চলে পানীয় জলে বিষাক্ত রাসায়নিক মেশানোও একটা অস্ত্র। এ ধরনের জিনিস আমেরিকার হাতে অনেক আছে। সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন — আমেরিকা বলছে এ ধরনের অস্ত্র যদি সাদ্দাম হোসেনের হাত থেকে সন্ত্রাসবাদীদের হাতে যায় তবে ভয়ানক বিপদ হবে, এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি? উত্তরে ডঃ সুশীল মুখোপাধ্যায় বলেন — আমেরিকার মাধ্যমে এসব অস্ত্র টেররিস্টদের হাতে যায়নি? কে বিক্রি করছে এসব অস্ত্র? সন্ত্রাসবাদ তো আমেরিকার হাতেই তৈরি। লাদেনও তো ওদেরই ট্রেনিং নিয়ে এসেছিল। তিনি বলেন — আমেরিকার অর্থনীতি ঋণে জর্জরিত, অর্থনৈতিক কারণ থেকেই তার রণসজ্জা।

সাংবাদিক সম্মেলনে ডঃ সুশীলকুমার মুখার্জী ও মানিক মুখার্জী

কালচিনিতে পুলিশ হেফাজতে মৃত্যু

এস ইউ সি আই-এর বিক্ষোভ

মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের আইন-শৃঙ্খলার মরুদ্যানে জলপাইগুড়ি জেলার কালচিনি থানায় পুলিশ ভাতখাওয়া চা-বাগানের অধিবাসী হেমন্তস চিকবড়াইককে নয়দিন ক্রমাগত অত্যাচারের পর ১০ ফেব্রুয়ারি পুলিশ হেফাজতেই খুন করেছে। বামপন্থায় জলাঞ্জলি দিয়ে সি পি এম নেতৃত্ব ব্রিটিশ ও কংগ্রেস আমলের মতোই থানায় থার্ড ডিগ্রি চালু রেখেছে। একসময় মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেছিলেন, সভ্য দেশে পুলিশ হেফাজতে পিটিয়ে খুন করা চলে না। অথচ তাঁর মুখ্যমন্ত্রীত্বেও পুলিশকে সরকারি গুণ্ডার মতো ব্যবহার করা হয়েছে। বামফ্রন্টের ২৫ বছরের শাসনে পাঁচশোর বেশি মানুষ পুলিশ ও জেল হেফাজতে মারা গিয়েছে (প্রতিদিন ২৬.৬.০২)। ১.৪.০১ থেকে ৩১.৩.০২ পর্যন্ত এক বছরে পুলিশ হেফাজতে মারা গিয়েছে ২১ জন।

শুধু তাই নয়, নাগরিক ও মানবিক অধিকার পদদলিত করে সি পি এম শাসনে গ্রামেগঞ্জে চালু হয়েছে বদলি অ্যারেস্ট প্রথা। অভিযুক্তকে না পেলে পুলিশ সম্পূর্ণ নিরপরাধ আত্মীয়স্বজনদের ক্রিমিনালদের মতো তুলে নিয়ে পণবন্দী করে রাখছে। কালচিনি থানার পুলিশও তাই করেছে। ২৮ জানুয়ারি রাত সাড়ে এগারোটায় একদল মদ্যপ পুলিশ হেমন্তস চিকবড়াইক-এর বাড়িতে চড়াও হয়। তাকে না পেয়ে তার সত্তরোধর্ব পিতা বালকা চিকবড়াইক, দাদা বিসুন চিকবড়াইক এবং গর্ভবতী স্ত্রী সুকুরমণি চিকবড়াইককে নির্মমভাবে পেটায় এবং বিসুন চিকবড়াইককে ধরে নিয়ে গিয়ে থানায় আটকে রাখে। পুলিশ বলে, হেমন্তসকে ধরিয়ে না দিলে বিসুনকে তো ছাড়া হবেই না, বরং গোটা শ্রমিক বস্তির ওপর অত্যাচার চালানো হবে। ১লা ফেব্রুয়ারি পুলিশ হেমন্তসকে ধরে এবং টানা ৯ দিন তার ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালায়। নির্যাতনের ফলে ১০ ফেব্রুয়ারি হেমন্তস প্রাণ হারায়।

এই ঘটনার প্রতিবাদে ১১ ফেব্রুয়ারি এস ইউ সি আই দলের নেতৃত্বে মিছিল ও পথ অবরোধ করা হয়। কালচিনি বি ডি ও অফিসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

১৩ ফেব্রুয়ারি বি ডি ও'র কাছে স্মারকলিপি দিয়ে ঘটনার বিচারবিভাগীয় তদন্ত, দোষী পুলিশদের গ্রেপ্তার ও শাস্তি এবং নিহতের পরিবারের জন্য উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়। অতিরিক্ত জেলা শাসককেও স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে এবং বিষয়টি মানবাধিকার কমিশনের কাছে আনার প্রস্তুতি চলছে।

গ্রাহকদের প্রতি

ডাকযোগে সাপ্তাহিক গণদাবীর গ্রাহকদের কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে, তাঁরা যেন সত্বর বকেয়া/নবীকরণ চাঁদা পাঠান। অন্যথায় পত্রিকা পাঠানো কঠিন হবে।

গ্রাহক চাঁদা

বার্ষিক — ৯১.০০ টাকা
ষান্মাসিক — ৪৬.০০ টাকা
বাংলা দেশ — ১৩০.০০ টাকা (বার্ষিক)

ম্যানেজার, 'গণদাবী'

সম্পাদক আশুতোষ ব্যানার্জী কর্তৃক ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত।
ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৪৪-০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৪৪২২৩৪, ২২৪৪১৮২৮ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৬-৫১১৪ ই-মেল ঃ suci_cc@vsnl.net